

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

# ইতি তোমার মা

ইতি তোমার মা

# ইতি তোমার মা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৫
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

ISBN 81-7066-103-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১২·০০

আমার মাকে

**এই লেখকের অন্যান্য বই**

- রুকু-সুকু
- কলকাতার নিশাচার
- ইতি পলাশ
- দুই মামা
- জনার্দনের জর্দার কৌটো
- দাঁদুর কাঠাল
- বালির ওপর পোল
- বড় হওয়ার বিষম বিপদ
- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
- কিশোর গল্প সমগ্র

এই একটু আগে মা বাবাকে খুব তিরস্কার করেছে। বকেছে বললুম না, কারণ আমার বাংলার মাস্টারমশাই বলেছেন, 'সবসময় ভাল ভাল বাংলা শব্দ ব্যবহার করবে। বাংলা যদি শিখতে চাও বাঙালী হও। মাটিতে আসন পেতে কাঁসার থালায় ভাত খাবে, কাঁসার গেলাসে জল খাবে। স্নান করে গামছায় গা মুছবে। গায়ে ঘষে ঘষে সরষের তেল মাখবে। এখন ছোট আছ, হাফপ্যান্ট পরো ক্ষতি নেই। বড় হয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে।'

আমি তখন মশারির ভেতর চুপটি করে শুয়ে আছি। ঠিক ভোর পাঁচটায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। আমার দাদু আমাকে জন্মদিনে ঘড়িটা উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'বুড়ো, আমার তো যাবার সময় হল, তোকে আজ আমি তিনটে কথা বলে যাই। তিনটে উপদেশ। রোজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছাড়বি। রোজ ঝড় হোক, জল হোক ব্যায়াম করবি, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে চান করবি। আর কাজ ফেলে আড্ডা মারবি না।'

এই কথা বলার সাতদিন পরেই সন্ধেবেলা দাদু হাসতে হাসতে মারা গেলেন। বিছানায় বসে আমাকে হরিদ্বারের গল্প বলছিলেন। গল্প আর শেষ হল না। কত দূর অবধি বলেছিলেন, আমার মনে আছে। দাদু যেখানে গেছেন, আমাকেও তো একদিন যেতে হবে সেখানে। গিয়ে দেখব, বিশাল বড় এক বাগানে দাদু বসে আছেন গাছতলায়। আমি গিয়েই তাঁর পাশে বসে পড়ব পা ছড়িয়ে। স্বর্গে তো মানুষের কোনও কাজ থাকে না। শুধু গান আর গল্প। পরীক্ষা দিতে হয় না, চাকরি করতে হয় না। কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। 'ভোট দিন, ভোট দিন,' বলে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে না। বোম ছোঁড়ে না। ক্রিকেটে ভারত পাকিস্তানের কাছে গো-হারান হেরে মন খারাপ করে দেয় না। হারবে কি, স্বর্গে তো

ক্রিকেট খেলাই হয় না। সেখানে ভগবান শুধু মাঝে-মাঝে দাবা খেলেন। গাছে-গাছে এক রকমের মিষ্টি ফল ঝোলে। যেই খিদে পাবে অমনি পেড়ে খাও। শরবতের নদী। সন্দেশের পাহাড়। নীল-নীল পাখি ডালে বসে শিস দিচ্ছে। এদিক ওদিক দু'চারটে কথা বলেই দাদুকে বলব, 'গল্পটা বলুন। সেই সন্ধেবেলা চণ্ডীপাহাড় থেকে নেমে এলেন, এসে দেখলেন এক সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছেন। চারপাশে শুধু নুড়ি আর নুড়ি। হড়হড় করে ছুটে চলেছে গঙ্গার জল। শেষ সূর্যের আলোয় পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে সোনার পাহাড়...'

দাদু আমাকে যা-যা বলেছেন আমি সব সেইভাবে করি। আমার ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজলে, বাবা-মা দু'জনেই উঠে পড়ে। না উঠে উপায় আছে! সে যা অ্যালার্ম! থেমে থেমে সাত বার বাজবে। আর আমার একটা লোমঅলা সাদা কুকুর আছে। ভারী লক্ষ্মী ছেলে। নাম তার পিঙ্কা। সে ওই অ্যালার্ম ঘড়িটাকে একেবারে পছন্দ করে না। তেড়ে তেড়ে যাবে আর ঘেউঘেউ করবে। কারও ক্ষমতা আছে আর ঘুমোয়! আমি তবু শুয়ে ছিলুম। বাবা মুখ ধুয়ে এসে মা'কে বললে, "আমার কাছে কিন্তু বাজার করার মতো আর টাকা নেই।"

মা বললে, "সে আবার কী? পরশু তোমাকে দুশো টাকা দিয়ে বললুম, এই আমার শেষ। মাসের আর সাতদিন আছে, এইতেই কোনও রকমে হিসেবটিসেব করে চালাতে হবে। কী করলে, সে-টাকা?"

বাবা বললে, "বিশ্বাস করো আমি নিজের জন্যে এক পয়সাও খরচ করিনি। টাকাটা একজনকে দিতে হল।"

"একজনকে দিতে হল মানে? কাকে দিলে? কেন দিলে?"

"আমাদের অফিসের পিওন মধুকে দিয়েছি। বেচারা বড় বিপদে পড়েছে। মানুষের যে কতরকম বিপদ হয় বুঝলে! সে তুমি ধারণা করতে পারবে না। হঠাৎ। একেবারে হঠাৎ। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিন বছরের বাচ্চা মেয়েটা খেলছিল। খেলতে খেলতে, সোডা-সাবান গোলা গরমজলের গামলায়। ইস, অতটুকু মেয়ে! কী যে এখন হবে। বাঁচবে তো!"

বাবার মুখটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। আমার মায়ের কিন্তু কিছুই হল

না। মা বড়-বড় চোখ করে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি মশারির ভেতর থেকে বললুম, "বাবা, তুমি ভেবো না, ও ভাল হয়ে যাবে। এক মাসের মধ্যে একেবারে ফিট হয়ে যাবে।"

মা তখন গড়গড় করে বাবাকে এক গাদা কথা শুনিয়ে দিলে, "হ্যাঁ, তোমার লোকের জন্যে দরদ একেবারে উথলে ওঠে। প্রতি মাসেই একে দুশো, ওকে একশো। তোমার কি জমিদারি আছে? অ্যাঁ, আমি বলে টেনে-টেনে এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছি। আমার দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করো না। আমার শাড়ি ছিড়েছে। তোমার জুতো ছিড়েছে। ছেলেটার কোথাও পরে যাবার মতো ভাল জামা-প্যান্ট নেই।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে বললুম, "আমার জামা-প্যান্ট দরকার নেই। আমার যা আছে, অনেক আছে।"

আমি বাবার দলে। মা র খালি হিসেব। একটা ডায়েরি আছে, তাতে খালি লিখবে, আলু, এক কেজি। করলা, দুশো। টোম্যাটো, এক কেজি। ডায়েরিতে ওসব কেউ লেখে! লিখে কী হয়? খাব। ফুরিয়ে যাবে। পয়সা থাকে আবার আনব। না থাকে, ভাতে জল ঢেলে নুন মেখে খাব। কী সুন্দর লাগে। আমি তো প্রায়ই তাই খাই। বাবা আমাকে বলেছেন, "দ্যাখ বুড়ো, আমরা কিন্তু বড়লোক নই। আমাদের একটু কষ্ট করেই চলতে হবে। আমার না টাকাপয়সাটা ঠিক আসে না। ওসব আমি পারি না, বুঝলি! আমি না তোকে রোজ মাছ, মাংস, কালিয়া, পোলাও খাওয়াতে পারব না। চুক্তি। সারেণ্ডার।"

আমি বলেছি, "ওসব আমি খেতে চাই না।"

বাবার সে কী আনন্দ? বললে, "হাত মেলাও?"

আমার দাদু ছিলেন শিক্ষক। হরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনের হেডমাস্টার। বাবার মুখেই শুনেছি, খুব কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলত। দাদু বলতেন, কষ্ট না করলে মানুষ হওয়া যায় না। আমি তো মানুষই হতে চাই। খুব বড়। আমার দাদুর চেয়েও বড়। দাদু তো আমাকে বলে গেছেন, 'তোমাকে আমি ওপর থেকে আশীর্বাদ করব। ভগবানকে বলব, আমার একটাই মাত্র নাতি। নাতিটাকে মানুষ করে দাও ভগবান।'

মা চায়ের কাপ হাতে ঘুরছে। বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না। বকুনি খেয়ে

বাবা কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। মা আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "বাবা কোথায় রে ? কোথায় গেল লোকটা !"

আমার মায়ের খুব মজা আছে। যখন রেগে গেল, চোখ-মুখ লাল। যা মুখে আসছে, তা-ই বলে যাচ্ছে। ঠিক পাঁচ-দশ মিনিট পরে সব ঠাণ্ডা। তখন একেবারে মাটির মানুষ। দাদু বলতেন, "বুড়ো, তোর মা টা রাগপ্রধান ; কিন্তু উচ্চাঙ্গের। সুর আছে, লয় আছে, তাল আছে !" আমার মায়ের সঙ্গে দাদুর খুব জমত। দাদু তো মা কে পড়াতেন। তখন যে কী সুন্দর দেখাত। মা তখন ছাত্রী। একটু বকুনি-টকুনিও হত। বাবা ওপাশে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দে নাচত। 'ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে।' বাবা একদিন বললে, "মাথা মোটা।"

দাদু বললেন, "তুমি দুঃখ পাবে, তা পাও, তবু বলি তোমার চেয়ে আমার বউমা র মাথা হাজার গুণ ভাল। আর কিছুদিন সময় পেলে ওকে আমি পি· এইচ· ডি· করিয়ে যেতুম।"

দাদুর কথা বলতে বলতে মা যখন-তখন কেঁদে ফেলে। বলে, "ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিল, যাও বা একটা বাবার মতো বাবা পেলুম, ভগবান নিয়ে নিলেন।"

বাবার মন খারাপ হলে কোথায় কোথায় থাকে আমি জানি। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে ছোট একটা বাগান-মতো আছে। আমার দাদু খুব যত্ন করতেন। এখন মা করে, বাবা করে, আমি তো খুব করি। বাগানে দাদুর করা দুটো গাছ, একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা রাধাচূড়া বেশ বড় হয়েছে। কৃষ্ণচূড়াকে দাদু বলতেন, 'আমার বাবা যোগীন্দ্রনাথের স্মৃতি। আর রাধাচূড়াটা হল আমার মায়ের স্মৃতি।' আমার একটা দিদি হয়েছিল। সে বেশি দিন বাঁচেনি। দাদু তার নামে একটা কামিনী করেছিলেন। সেটাও বেশ গোল-মতো, ঝাঁকড়া-মতো হয়েছে।

আমার মা দাদুর নামে একটা গন্ধরাজ পুঁতেছে। বেশ হয়েছে গাছটা। গন্ধরাজের পাতা আর ফুল, দুটোই সুন্দর। বাবা সেই গাছটার তলায় উবু হয়ে বসে মাটি আলগা করে দিচ্ছে। আপন মনে ঘাসের ফলা একটা একটা করে তুলছে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা ঝরে-ঝরে বাবার মাথায় পড়েছে। পাঁচিলের গায়ে বোগেনভেলিয়া লাল হয়ে আছে। সেই লালের আভা

এসে পড়েছে বাবার সাদা গেঞ্জিতে।

আমি বাবার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে বললুম, "তুমি কী করছ বাবা ? চা খাবে না ? বাজারে যাবে না ?"

বাবা উদাস সুরে বললে, "গেলেও হয়, না গেলেও হয়।"

আমি বাবার পাশে উবু হয়ে বসে বললুম, "তোমার রাগ হয়েছে ?"

"আমার খুব দুঃখ হয়েছে।"

"তুমি দুম করে দুশো টাকা দিয়ে দিলে কেন ? তাই তো মা তোমাকে বকল। সব কিছু তো বুঝেসুঝে করবে !"

"তুই হলে কী করতিস ?"

"তুমি যা করেছ তাই করতুম।"

"হাত মেলা। তোর মা'টা একটা থার্ড ক্লাস।"

"মা কে থার্ড ক্লাস বলতে নেই গো। তোমার মাকে তুমি থার্ড ক্লাস বলতে পারতে ?"

"তা অবশ্য পারতুম না। তবে তুই তো আমার মা কে দেখিসনি। আমার মায়ের মনটা ছিল গন্ধরাজ ফুলের মতো। ধর, আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে মা সবে খেতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাড়িতে অতিথি। তাকে সব বেড়ে দিলেন। মা এইবার কী করলেন, পাছে কেউ বুঝতে পারে উপোস, এক খিলি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ঘুরতে লাগলেন। কেউ বুঝতেই পারল না মায়ের উপোস। এই রকম প্রায় হত। প্রায় হত। আমার মা কি যে-সে মা ছিলেন ! যাঃ যাঃ।"

"আমার মা ও সাঙ্ঘাতিক মা। তুমি আমার মায়ের কতটুকু জানো ? আমার মা বিনা পয়সায় তিনটে মেয়েকে পড়ায়। সেদিন রমলাদির মেয়েকে ষাট টাকা দিয়ে একটা জামা কিনে দিয়েছে। জানো কি তা !"

"সত্যি ! অন গড !"

"অন গড।"

আমাদের সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। মা আসছে চায়ের কাপ নিয়ে।

"কী, তুমি চা খাবে না ?"

আমি বললুম, "কেন খাবে না। চা না খেলে সকাল হয় নাকি ?"

মা বললে, "তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না। এই নাও, ধরো।

প্রথম চা টা ফেলে দিয়ে আমি আবার করে নিয়ে এলুম তোমার জন্যে।"

বাবা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। এখনও বাবার মুখে হাসি ফোটেনি। মা একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। দু' আঙুলে একটা ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বললে, "দুশো টাকায় হবে তো ?"

"কী হবে ?"

"তোমার ওই পিওনের মেয়ের চিকিৎসা !"

"এ-বাজারে দুশো টাকায় চিকিৎসা হয় ! সরকারি আপিসের পিওন আর কত টাকা মাইনে পায় বলো। তার ওপর দু'তিনটে ছেলেমেয়ে।"

"তুমি তা হলে আজ বরং আরও একশো টাকা দিয়ে দাও।"

"আর টাকা কোথায় পাব ?"

"যেখান থেকে চিরকাল পাও। একটা জিনিস কিনব বলে কিছু টাকা কী করে যেন জমিয়েছিলুম, তার থেকে তোমাকে দেব। হ্যাঁ গো, মেয়েটা বাঁচবে তো !"

"ভগবানকে ডাকতে হবে। খুব করে ভগবানকে ডাকো।"

মা উঠে রান্না ঘরে চলে গেল। বাবা বললে, "দেখলি ? এমন মা তুই দুটো পাবি ? আর একটা তুই খুঁজে বের কর, আমার কান কেটে ফেলব।"

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এইবার। বাবার মুখে হাসি ফুটেছে। গম্ভীর হয়ে মন খারাপ করে থাকলে ভাল লাগে নাকি ? এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি বাজারের ফর্দ হচ্ছে। বাবা বাজার করতে ভীষণ ভালবাসে, মা ভালবাসে ফর্দ করতে। এই এনো, সেই এনো।

মা বলছে, "কপিতে অরুচি ধরে গেল। কপি আর এনো না। পটল ওঠেনি ?"

"উঠবে না কেন, দাম শুনলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, বলে কুড়ি টাকা কেজি। যে সরকারই গদিতে বসুক, বাজার দরটাকে কেউই ঠিকমতো ধরতে পারছে না। ও একেবারে লাগামছেঁড়া ঘোড়া। আর আমারও ছাই হয়েছে, কিছুতেই রোজগার বাড়াতে পারছি না।"

আমি বললুম, "তুমি একটা লটারির টিকিট কেনো না বাবা !"

"ধুর, এর আগে আমি টানা একবছর লটারির টিকিট কেটেছি, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, অরুণাচল, কিস্যু হয়নি।"

“ধ্যানেশকাকু গত সপ্তাহে দশ টাকা পেয়েছে জানো ?”
“দশ টাকা একটা পাওয়া হল ?”
“তা হল না, তবে পেয়েছে তো ! এইবার একদিন দশ লাখ টাকা পেয়ে যাবে ।”
“আমি দশ লাখ টাকা পেলে একটা ফোয়ারা করব ।”
মা বললে, “সে আবার কী ?”
“ফোয়ারা । ফোয়ারা দ্যাখোনি ! কলকাতার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে আনব, এনে আমাদের ওই বাগানের মাঝখানটা গোল করে খুঁড়ে নীল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে সুন্দর একটা ফোয়ারা । ফুস-ফুস করে জল একেবারে দোতলা পর্যন্ত উঠে যাবে, এত ফোর্স । একপাশ থেকে নীল, আর একপাশ থেকে লাল, আর এক পাশ থেকে হলদে আলো ফেলব রাতে । সে একেবারে স্বপ্ন । দুপুরবেলা ঝাঁক-ঝাঁক পাখি আসবে চান করতে । তিনটে গোলমতো গার্ডেন চেয়ার পেতে রাখব । আমরা তিনজন বসে-বসে সল্টেড বাদাম-ভাজা খাব । আর গল্প করব । একটা পাহাড় থাকলে ভাল হত ।”
“পাহাড় মানে ?”
“পশ্চিমবাংলার কী দুর্ভাগ্য বলো তো ?
“পার্টিশান, দেশ বিভাগ ?”
“ধুর, সে তো হয়ে গেছে । যা গেছে তা গেছে । পশ্চিমবাংলার আকাশটা বড় ফাঁকা । আকাশের গায়ে কেমন একসার নীল পাহাড় লেগে থাকবে । মাঝে-মাঝে সেই পাহাড়ের মাথায় মেঘ এসে জড়িয়ে যাবে । এত জায়গায় এত সব কাণ্ড হয়, পাহাড় সমুদ্র হয়, সমুদ্র পাহাড় হয়, আমাদের এখানে ছাই কিছুই হতে চায় না । জানো তো একদিন কী হয়েছে, আমি স্বপ্ন দেখছি আমাদের চিলের ছাতে উঠলে উত্তর আকাশে স্পষ্ট একটা পাহাড় দেখা যায় । ভোরের স্বপ্ন এত সত্যি মনে হল, ঠিকই তো, কোনওদিন তো চিলের ছাতে উঠিনি, উঠলে নিশ্চয় পাহাড় দেখা যায় ! সেই ভোরে কোনওরকমে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠলুম গিয়ে চিলের ছাতে । ভোরের নীল আকাশ । ঠাণ্ডা বাতাস বইছে । তখনও চোখে ঘুম লেগে আছে । কত আশা নিয়ে উত্তরের আকাশের দিকে তাকালুম, কত

ভাবে তাকালুম। কোথায় কী? তবে আমার এখনও বিশ্বাস, এ-পাড়ায় মনুমেন্টের মতো বিশাল উঁচু একটা বাড়ি থাকলে নিশ্চয় পাহাড় দেখা যেত।"

মা বললে! "কী করে তোমার এই ধারণাটা হল। তুমি তো পশ্চিমবাংলার ভূগোল পড়েছ। উত্তরে হিমালয় ছাড়া আর কিছু আছে? দক্ষিণে সমুদ্র। মাঝে সমতল-ভূমি। বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ায় ছোটখাটো একটা-দুটো পাহাড় আছে। এখানে তুমি পাহাড় পাচ্ছ কোথায়?"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে কখন কী হয়, বলা কি যায়!"

বাবা ঝোলাঝুলি নিয়ে বাজারে বেরিয়ে গেল। মা বললে, "বুড়ো, এবার দয়া করে একটু পড়তে বোসো।"

পড়তে তো আমি বসবই। আমাকে বড় হতে হবে। আমার দাদু কত বড় ছিলেন! এখনও সবাই তাঁর নাম করে।

সিঁড়ির তলায় ছোট্ট একটা ঘর আছে। চোর-কুঠরি। এখানে আমার দাদু ধ্যানে বসতেন। এই ঘরটা এখন আমার পড়ার ঘর। খুরখুরে একটা টেবিল-পাখা আছে। ওইতেই আমার হয়ে যায়। দাদু বলতেন, 'বুড়ো, শরীরটাকে বেশি আয়েসি করিসনি। বেশ একটু কষ্টে রাখবি। মনের কথা শুনবি না। শুনবি বাস্তব বুদ্ধির কথা। তা হলে আর বিপদে পড়তে হবে না। যেমন ধর, ভীষণ গরম। ঠাণ্ডা আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে। বাস্তব বুদ্ধি কী বলছে, গরমে আইসক্রিম খেলে গলায় ঠাণ্ডা লেগে যায়। সর্দি-কাশি হয়। ধর, মন বলছে, খেলতে যাই। পড়ার চেয়ে খেলাই ভাল। বাস্তব বুদ্ধি কী বলছে, পড়াশোনা করে শিক্ষিত না হলে, বড় অবস্থায় জীবন ঘোর অন্ধকার। আর একটা কথা মনে রাখিস, চিরকাল মানুষের সমান যায় না। আজ যে বড়লোক, কাল সে গরিব হয়ে যেতে পারে।'

দাদুর এইসব কথা আমি জীবনে ভুলব না। আমার এই চোর-কুঠরির বাগানের দিকে ছোট্ট একটা জানলা আছে। জানলাটা খুলতেই দেখি, বাবা চুপিচুপি বাগানের পথ ধরে আসছে। হাতে বাজারটাজার নেই। বুকের কাছে দু'হাত দিয়ে তোয়ালে-মোড়া কী একটা ধরে আছে।

আমি একটু জোরেই বলে ফেলেছি, "কী গো বাবা, তোমার বাজার?"

বাবা বললে, "শ্‌শ্‌।"

মুখ দেখে মনে হল, বেশ গোলমেলে ব্যাপার। বাবা আবার একটা কিছু পাকিয়ে বসেছে। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কী করেছ ?"

বাবা জানালার একেবারে পাশে এসে তোয়ালে সরিয়ে দেখাল। এইটুকু একটা বেড়ালবাচ্চা। সাদা ফুটফুট করছে। সর্বনাশ করেছে!

"বাবা, মা তোমাকে এইবার ভীষণ বকবে। বাড়িতে বেড়াল ঢুকিও না।"

"কী যে বলিস! কত কষ্টে এটাকে জোগাড় করেছি জানিস। এর মা হল কাবলি বেড়ালের জাত। এর মা কে তুই দেখেছিস ? মান্তুবাবুদের বাড়িতে। এই মোটা ল্যাজ। বরফের মতো সাদা। মান্তুবাবুর মেয়ে মল্লিকাকে আমি কত করে বলেছিলুম। আজ দিয়ে দিলে। উঃ, কী ভাগ্য!"

"ভাগ্যে তোমার খুব দুঃখ আছে বাবা। বেড়াল দেখলেই মায়ের অ্যালার্জি হয়।"

"ধুর, সে হল গিয়ে তোর নেঙটি বেড়াল। সরু-সরু ল্যাজ। সিড়িঙ্গে শরীর। এ-সব বেড়াল হল জাতের বেড়াল।"

চমকে উঠেছি আমি। মা একেবারে আমার পেছনে। বেশ চড়া গলায় বললে, "এ কী, তুমি এখনও বাজারে যাওনি ? তোমার হাতে ওটা কী ?"

বাবা এক গাল হেসে বললে, "দ্যাখো না, তোমার জন্যে কী সুন্দর একটা জিনিস এনেছি।"

"কী ওটা ? বেড়াল ? ফেলে দাও। ফেলে দিয়ে এসো শিগগির।"

"আরে এটা কাব্‌লের বাচ্চা।"

"কাব্‌লে-মাব্‌লে আমি বুঝি না। বেড়াল এ-বাড়িতে ঢুকবে না। তুমি কি আমাকে রাঁচি পাঠাবার তাল করেছ ?"

বাবার হাসি-হাসি মুখ করুণ হয়ে গেল। বেড়ালছানাটা বুকের কাছে লেপটে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। সবে চোখ ফুটেছে।

আমি বাবার হয়ে মা কে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, "বাড়িতে একটা বেড়াল থাকা ভাল মা। দেখছ তো ইঁদুরের কী উৎপাত!"

"হ্যাঁ, বাপ-ব্যাটায় মিলে তোমরা বাড়িটাকে একটা চিড়িয়াখানা বানাও। ওকে কুকুরের হাত থেকে কে সামলাবে! তিন মিনিটের মধ্যে পিঙ্কা শেষ করে দেবে।"

"মা, সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সামলাব।"

"যা ভাল বোঝো করো। আমি কিছু বলতে চাই না। বললেই সব রাগ হয়ে যাবে।"

মা চলে গেল। দূর থেকে বললে, "আজ তা হলে দোকান-বাজার বন্ধ। বাঁচা গেছে। আমি উনুনে জল ঢেলে দি।"

বাবা বললেন, "হাত মেলা বুড়ো। তোর মা জিরো রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরে গেল। একে কী বলে বুড়ো?"

"লেম ডাক।"

"সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। এর এই সোনা-সোনা মুখটা দেখে, বুঝলি বুড়ো, ভদ্রমহিলা কাত। নে, ধর। আমি এইবার একটু সংসারের কাজে মন দি। সংসার তো করিসনি, করলে বুঝতিস কী ঠ্যালা!"

তুলতুলে নরম বেড়ালটাকে প্রথমে রাখলুম আমার বইয়ের টেবিলে। এই বয়েসেই কী বড়-বড় লোম হয়েছে। ল্যাজের কোয়ালিটি দেখেই বুঝতে পারছি বড় হলে ঠিক চামরের মতো হবে। চোখ দুটো কী সুন্দর! যেন একজোড়া বৈদূর্যমণি।

টেবিলে থাকতে চাইছে না। ভাল করে দাঁড়াতে শেখেনি এখনও। চারটে পা-ই দুর্বল। কাঁপতে কাঁপতে একটু করে এদিকে যায়, একটু করে ওদিকে যায়, আর খুব মিহি গলায় মিউমিউ করে। মহা বিপদ হল তো! এই রকম করলে মা আবার রেগে যাবে।

"দু দণ্ড স্থির হয়ে বোস না ভাই।"

পিঙ্কার কান সাঙ্ঘাতিক কান। সামান্য একটু মিউ করেছে, অমনি হ্যাহ্যা করতে করতে ছুটে এসেছে। এসেই টেবিলের ওপর সামনের দুটো পা রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। মুখটা টেবিলের কানায় রেখে জিনিসটাকে ভাল করে দেখে নিল। তারপর একটু করে ফোঁসফোঁস করে আর থেকে-থেকে গোঁ। শেষে কানের পর্দা ফাটানো একটা ডাক, ঘেউ।

ওইটুকু বেড়াল হলে কী হবে! বেশ তেজ আছে। ধনুকের মতো

বেঁকে, লোম খাড়া করে, খুদে ল্যাজটা ফুলিয়ে মুখ দিয়ে ফ্যাঁ-ফ্যাঁ শব্দ করতে লাগল। এর ঘেউ, ওর ফ্যাঁস, এই চলতে লাগল। আমি বলি, "ও পিঙ্কা, অমন করে না বাবু, ও তোমার ভাই হয়, ভাই।"

কে কার কথা শোনে। এর ঘেউঘেউ যত বাড়ে, ওর ফ্যাঁসফোঁস তত বাড়ে। আবার পিঙ্কার যা স্বভাব! কোনও কিছু তার থাবার নাগালের মধ্যে না হলে, খসর-খসর করে আঁচড়াবে আর কাঁপতে থাকবে। বেড়ালটা দু'থাক বইয়ের মাঝখানের সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। পিঙ্কা পা দিয়ে ঠেলে সব বই হুড়মুড় করে মাটিতে ফেলে দিল। ছোট্ট একটা জলচৌকির ওপর বসানো ছিল পিলসুজ আর তেলভর্তি প্রদীপ। বইয়ের ধাক্কায় ছিটকে চলে গেল ঘরের কোণে। প্রচণ্ড শব্দে মা ছুটে এসেছে। অসভ্য পিঙ্কাটা তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে।

রাগে মায়ের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। মা তো ভীষণ ফর্সা। আমার পিসিমা র মুখে শুনেছি, এইরকম রংকে বলে দুধে-আলতা রং।

মা বললে, "কী দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে শুনি! এসব কী হয়েছে?"

"আমি করিনি মা, পিঙ্কা করেছে।"

সারা মেঝেতে তেল। প্রদীপটা এক পাশে উপুড়। তেলের ওপর আমার ইতিহাস বই। অঙ্কের খাতা। পিঙ্কাটা তো খুব ওস্তাদ। সে অমনি মায়ের কোমরে পা দুটো তুলে দিয়ে আড়ামোড়া ভেঙে, থুপুস করে পায়ের কাছে নেমে মুখ ঘষতে লাগল। চালু ছেলে!

মা বললে, "আমি আজই চলে যাব। সারদামঠে মাতাজিকে আমার বলাই আছে। খুব আমার সংসার হয়েছে! আমার সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। তোরা বাপ-ব্যাটায় সারাদিন ভূতের নৃত্য কর। আমি বাবা আমার মতো থাকি। অসহ্য, অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

বেড়ালটা বইয়ের মাঝখান থেকে মিউ করে উঠল। মায়ের পায়ের কাছ থেকে পিঙ্কা করল গোঁ।

"বুড়ো, তোকে আমি বারবার বলছি, বেড়াল আর কুকুর হল চিরশত্রু। কেন নিরীহ জীবটার মৃত্যুর কারণ হবি?"

"মা, তোমাকে আমি একটা কথা বলছি, দাদু আমাকে বলে গেছেন, 'বুড়ো, এই বাড়িটাকে একেবারে আশ্রমের মতো করে রাখবি। কারও

ওপর হিংসে করবি না।' তুমি কিন্তু মা বেড়ালটাকে হিংসে করছ।"

"আমি বেড়ালটাকে হিংসে করছি ? ও আমার কী এমন পাকা ধানে মই দিতে এসেছে যে, হিংসে করব ?"

"পিঙ্কার আদর কমে যাবে ভেবে তুমি হিংসে করছ। আর তুমি হিংসে করছ বলেই পিঙ্কাও হিংসে করছে।"

"খুব কথা শিখেছিস ! আমি কিন্তু বলে রাখছি, এরপর কোনও কিছু হলে 'ম্যা ম্যা' করে চিৎকার করবে না।"

"আমি তোমাকে বলে রাখছি, পিঙ্কাকে প্রথমে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা দেব, তারপর দেখবে আমাদের পুশ ওর পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"আরও একটা বল্, পুশের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধেড়ে ইঁদুর। অহিংসা যখন হচ্ছে, ভালভাবেই হোক।"

মা চলে গেল। পিঙ্কা আমার চেয়ারের তলায় শুয়ে পড়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। যাক, এখন সব শান্ত। দু'সার বইয়ের মাঝখানের গুহায় বেড়ালছানাটা বেশ মজা করে বসে আছে। আমি এবার পড়তে বসি।

আমার দাদু আমাকে বলে গেছেন, 'যে-কোনও কাজ করার আগে সঙ্কল্প করে নেবে। সেইটাই হল মানুষের ধর্ম। সঙ্কল্প তুমি কাগজে লিখতে পারো, আবার মনেও রাখতে পারো। দিন যখনই শুরু করো, শুরুর আগে সারাদিনে যা করতে চাও, এক, দুই করে কাগজে লিখে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখো। মনে রাখবে, একটা দিন মানে চব্বিশ ঘণ্টা। এই চব্বিশ ঘণ্টার আট ঘণ্টা তুমি ঘুমিয়ে কাবার করে দিলে। দু' থেকে তিন ঘণ্টা গেল চান-খাওয়ায়। তা চব্বিশ ঘণ্টার বারো ঘণ্টা এই ভাবেই গেল। হাতে রইল বারো। স্কুলে গেল ছয়। যাওয়া-আসা ধরো এক। হল সাত। হাতে রইল পাঁচ। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা গল্প কি গল্পের বই পড়লে হয়ে গেল। মাত্র তিন ঘণ্টা। সারাদিনে তিন ঘণ্টা।'

একটা কাগজে আজকের তারিখটা লিখলুম ; তারপর এক নম্বর, ইতিহাসটা ঝালাতে হবে। দু'নম্বর, ইংরেজি। তিন নম্বর, ফাটাফাটি। অঙ্ক। চার নম্বর, বাংলা প্রশ্নোত্তরের খাতা পুরনো খবরের কাগজের গাদায় খুঁজতে হবে। পাঁচ নম্বর, কাচের জারে যে গোল্ডফিশটা ভরে রেখেছি,

সেটাকে কেঁচো দেওয়া। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তার খাওয়া আর খেলা দেখা। ছ' নম্বর, স্কুলের ব্যাগটাকে গোছানো। সাত নম্বর, ছাত থেকে চিৎকার করে ডেকে শেখরকে জিজ্ঞেস করা, তুই টেনিস বলটা পেয়েছিস ? আট নম্বর, চান করতে যাবার আগে গাছের গোড়ায় গোড়ায় খোল-পচা সার এক হাতা করে দিতে হবে। বিশ্রী গন্ধ।

আমার অনেক অনেক কাজ। দাদু বলতেন, 'বুড়ো, কাজ ছাড়া থাকবি না। অলস মস্তিষ্ক হল শয়তানের বাসা।' বেড়ালটা গুটিগুটি বইয়ের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। আধবোজা চোখে মিউ-মিউ আরম্ভ করেছে আবার। পিঙ্কার ঘুম ছুটে গেল। চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের পাশে দু'পা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার ফোঁসফোঁস। বেড়ালটাকে থাবার নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না বলে উঁউঁ কান্না। মহা বিপদ তো !

পিঙ্কার লোমঅলা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিন-চারবার বললুম, "শিব, শিব।" এটা আমার দাদুর কাছ থেকে শেখা। দাদু বলতেন, 'মন উত্তেজিত হলে নিজের মাথায় হাত রেখে শিব শিব বলবে। দেখবে মন শান্ত হয়ে গেছে।' সত্যিই তাই। চেয়ারের পায়া ঘেঁষে পিঙ্কা ধুপুস করে শুয়ে পড়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা মনে হল দেখতে এসেছে, আমি পড়ছি কি না ! দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল, "কী করছিস ?"

"পড়ার চেষ্টা করছি মা।"

"সেই চেষ্টা কখন সফল হবে ?"

মা ঘরে এল। রাগ মনে হয় পড়ে এসেছে। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ফুলের মতো সাদা বেড়ালটাকে দেখছে। জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, চোখ ফুটেছে ?"

"মনে হয় ফুটেছে, মা। অল্প অল্প।"

"আহা, এতটুকু একটা বাচ্চাকে মায়ের কোলছাড়া করলে ! কে এখন তুলোয় করে দুধ খাওয়াবে। আয় আয়, চুক চুক।"

মায়ের ডাক। বেড়াল না-শুনে পারে ! এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মা বেড়ালটাকে বুকের কাছে তুলে নিল। মা আজ একটা হালকা হলুদ রঙের

শাড়ি পরেছে। সেই হলুদের বুকে সাদা বেড়াল।

আমি বললুম, "মা, তুমি আমার মা, পুশেরও মা।"

"হ্যাঁ, আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, পুশের মা হয়ে সারা দিন বুকে করে বসে থাকি।"

মায়ের কোলে বেড়াল দেখে পিঙ্কার মাথা আবার খারাপ হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠে ঘেউ-ঘেউ লাগিয়েছে। মা বলছে, "ছিঃ ছিঃ পিঙ্কা, হিংসে কোরো না, হিংসে কোরো না। তোমার ভাই। পুশ তোমার ভাই।"

এমন সময় বাবা বাজার থেকে ফিরে এল। হাতে বিশাল এক কাগজের বাক্স। গায়ে লেখা টিভি। মায়ের কোলে বেড়ালটাকে দেখে বাবা অবাক। আর বাবার হাতে ঢাউস একটা বাক্স দেখে মা অবাক।

বাবা হাসতে হাসতে বললে, "বুঝলে, আজ প্রমাণ পেলুম।"

"কী প্রমাণ পেলে?"

"যে খায় চিনি তারে জোগান চিন্তামণি। বাক্সটা পেয়ে গেলুম।"

"ওটা তোমার কী কাজে লাগবে? আরশোলা পুষবে?"

"না গো, এটা হল আমাদের পুশের বাড়ি। আমি বিলিতি বইয়ে দেখেছি বেড়ালরা সব বাক্সর মধ্যে থাকে। বাক্সর মধ্যে থাকতে ভালবাসে। তা পেয়ে গেলুম জিনিসটা। এইবার এটাকে ঠিকঠাক করে ওকে শুইয়ে দি।"

"আচ্ছা, তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে?"

বাবা এক মুখ হেসে বললে, "বয়েস তো মনের! মনের বয়েস যদি না বাড়ে, আমি কী করতে পারি!"

"লোকে হাসবে যে।"

"লোক! ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, লোক না পোক। পৃথিবীতে আমি আমার মতো থাকব, সে তার মতো থাকবে।"

এরপর বাবা বেড়ালের বাড়ি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমাকে বললে, "শোন বুড়ো, মানুষের বাড়ির প্ল্যান থাকে, বেড়ালের বাড়ি কী প্ল্যানে হয় রে!"

আমি একটু ভেবে বললুম, "শোনো, বেড়ালের তো আলাদা বাড়ি হয় না, মানুষের বাড়িতেই বেড়াল থাকে।"

"তা অবশ্য ঠিক। পাখির বাসা হয়। সে খুব সিম্পল। গাছের দুটো ডালের মাঝখানে একটা চুবড়ি। একমাত্র বাবুইপাখির বাসার মধ্যে কিছুটা কেরামতি আছে। তুই সাপের বাসা দেখেছিস ?"

"গর্ত দেখেছি।"

"গর্ত তো আর বাসা নয়, ওটা হল দরজা। ঢোকার পথ। ভেতরে অনেক ব্যবস্থা থাকে। মণিকোঠা। বেডরুম, বাথরুম, নার্সারি।"

"তুমি দেখেছ বাবা ?"

"না রে। আমার কি সে-ভাগ্য হবে ! আমার মনে হয়। সাপের অতবড় শরীরটা তা না হলে থাকে কীভাবে ? শীতকালে তো বাসা থেকে বেরোয় না। মাটির তলায় নিশ্চয় সেরকম ব্যবস্থা থাকে।"

"তুমি এইসব কী করে জানতে পারো বাবা ?"

"বুঝলি বুড়ো, অনেক জিনিস আছে যা জানা যায় না। ঠিকঠাক জানারও চেষ্টা করতে নেই। কল্পনা করে নিতে হয়। যেমন ধর, পরী। পরী কেউ কোনওদিন দেখেছে ? অথচ দ্যাখ, কত গল্প লিখে ফেলেছে। সেইসব গল্প পড়ে পড়ে আমার তো এখন মনে হয়, কোনওদিন সত্যিই একটা পরী দেখে ফেলব। চারপাশে ফটফট করছে চাঁদের আলো, নিশুতি রাত। কেউ কোথাও জেগে নেই। দূরে, অনেক দূরে টিসটিসি পাখি ডাকছে।"

"টিসটিসি পাখি কী পাখি বাবা ?"

"আমি সে-পাখি দেখিনি। আমি অনেক অনেক রাতে তার ডাক শুনেছি। অন্ধকার পক্ষে সে-পাখি ডাকে না। ডাকে শুক্লপক্ষে। টিসটিস করে। তোরা জানিস না। তোরা ঘুমিয়ে থাকিস বলে কত কী জানতে পারিস না। ফটফটে চাঁদের আলোর রাতে আমি ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে চুপিচুপি দাঁড়িয়ে থাকি। কেন বল্ তো ?"

"রাত তখন ক'টা হবে বাবা ?"

"তা ধর দুটো-টুটো হবে। বুড়ো, আমার কী মনে হয় জানিস ? কী বল তো ?"

"কী বাবা ?"

"সূর্যের আলো হল পাউডার। বালি-বালি। ভীষণ তেজ। আর চাঁদের

আলো হল লিকুইড। ভিজে-ভিজে। জলের মিহি কণার মতো। বাষ্পের মতো। অনেকক্ষণ চাঁদের আলোয় থাকলে দেখবি, গা কেমন যেন ভিজে-ভিজে লাগছে। আমার মনে হয়, চাঁদের আলো বরফ দিয়ে রাখলে, জমে মুক্তো হয়ে যায়!"

"মুক্তো তো ঝিনুকের পেটে হয় বাবা।"

"ধুর, ও তো হল বিজ্ঞানীদের কথা। বিজ্ঞান ছাড়াও তো পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে। সবই কি দুই আর দুয়ে চার ? আমার বাবার একটা নোটবুক আছে, সেইটা তোকে আমি একদিন চুপিচুপি দেখাব।"

"আমার দাদুর নোটবুক ?"

"হ্যাঁ রে, একটা বই বলতে পারিস। কী সুন্দর নাম, 'অপদার্থ বিজ্ঞান'।"

"তুমি ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াও কেন ?"

"যদি কিছু দেখতে পাই!"

"কী তুমি দেখতে পাবে বাবা ?"

"ধর, ফুটফুটে ছোট্ট একটা পরী ডানা মেলে উড়ে এল। ফুরফুর করে আপন মনে উড়তে লাগল গাছের মাথায়। এ-ডাল থেকে ও-ডালে। হতেও তো পারে। কে আর রাতের খবর রাখছে বল্। এই যেমন ধর মৎস্যকুমারী, মারমেড। নিশ্চয় আছে। যে দেখেছে, সে দেখেছে। আমি দেখিনি বলে নেই বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। স্নোম্যান, তুষারমানব। নিশ্চয় আছে। পৃথিবীতে কত কী আছে, কে বলতে পারে। তোর দাদুর লেখা অপদার্থ বিজ্ঞানটা পড়বি, পড়লে সব জানতে পারবি। জানিস তো, একদিন শেষ রাতে দেখি কী, তোর দাদু বাগানে ফুল তুলছেন। ঘাসের ওপর গুলঞ্চ ফুল ছড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি একটি-একটি করে তুলছেন আর চাদরের আঁচলে রাখছেন। আমি যেই ডাকলুম, বাবা, জায়গাটা কুয়াশার মতো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সব পরিষ্কার। কেউ কোথাও নেই।"

"সত্যি ?"

"অন গড।"

"তা হলে আমি তোমাকে বলব, এই ঘরে আমি একদিন দাদিকে দেখেছি।"

"এমন হতে পারে তুই বিশ্বাস করিস ?"

"করি বাবা।"

"হাত মেলা।"

"কী করে হয় গো ?"

"তা হলে শোন, ভাল করে মন দিয়ে শোন। একটা মানুষ, ধর ষাট বছর কি সত্তর বছর এই পৃথিবীতে বেঁচে গেল, তারপর সে কোথায় গেল ?"

"আকাশে চলে গেল।"

"বেশ, ধরে নিলুম আকাশেই গেল। তার মানে কি একেবারেই গেল ! অত সহজ ! এত বছর বেঁচে থাকাটা একেবারে বাজে হয়ে গেল ? যেমন ধর আমি এক্ষুনি ছাতে চলে গেলুম, তার মানে কী, আমি এ-ঘরে নেই, কিন্তু ছাতে আছি। আসলে কী জানিস, মন দিয়ে টেনে রাখলে কেউ যেতে পারে না। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ঠিকমতো বুঝতে পারিসনি। দাঁড়া, আর-একটু বোঝাই তোকে। আরও সহজ করে। মনে কর, আকাশে আমি একটা ঘুড়ি বেড়েছি। সুতো যদি আমার হাতে থাকে, আমি ঘুড়িটাকে টেনে নামাতে পারি, আবার দূরে বেড়ে যেতে পারি। পারি কি না ?"

"হ্যাঁ পারো।"

"ব্যস, আর ভাবনা নেই। বুঝে গেছিস। মন হল সেই সুতো। কী রকম বোঝালুম বল্ ?"

"সত্যি, ভাল বুঝিয়েছ। দারুণ বুঝিয়েছ।"

"আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। ডাকসাইটে শিক্ষক। তোর বাবার মতো এলেবেলে রামছাগল নয়।"

"আহা, আমি যেন জানি না। তুমি খুবই ভাল ছেলে ছিলে। পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে। ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম· এ· পাশ করেছ। দাদি তোমার কত প্রশংসা করতেন আমার কাছে। বলতেন, 'আমার ছেলের মতো ছেলে হয় না। তোমাকেও তোমার বাবার মতো হতে হবে।'"

"ধুত, আমি একটা ছেলে ! আমার বাবার কোনও সেবা করতে পারলুম

না। অপদার্থ। সারাটা জীবন সেই মানুষটি আমার জন্যে কষ্ট করে গেলেন। আমি কিচ্ছু করতে পারলুম না।"

তিন-চার বার, কিচ্ছু করতে পারলুম না, কিচ্ছু করতে পারলুম না, বলতে বলতে বাবা কেঁদে ফেললে। আমি উঠে গিয়ে মা কে বললুম, "দ্যাখো গে যাও, বাবা কী রকম কাঁদছে।"

মা ছুটে গেল। দাদি চলে যাবার পর থেকে, বাবা এইরকম প্রায়ই কেঁদে ফেলে। দাদির কথা বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যায়।

এদিকে আর এক কাণ্ড। মা পুশটাকে মেঝেতে ফেলে রেখে বাবার কাছে ছুটে গেছে। আমারও খেয়াল ছিল না। পিঙ্কা ছুটে এসেছে। আমি কোথায় বেড়ালটাকে ঝট করে কোলে তুলে নেব, তা না, চোখ বুজে মনে-মনে বলতে শুরু করেছি, 'দাদি, পুশকে বাঁচাও। দাদি, পুশকে বাঁচাও।'

ভেবেছিলুম ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক করে একটা আওয়াজ শুনব আর তাকিয়ে দেখব সব শেষ। তার বদলে শুনলুম, পিঙ্কা যেন আদুরে গলায় কাকে অল্প-অল্প ধমকাচ্ছে। আর তার পায়ের খচরমচর শব্দ হচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। ওরে ভাই, দু'জনে বেশ ভাব হয়ে গেছে। খেলা হচ্ছে। পুশ শুয়ে আছে চিতপটাং, আর পিঙ্কা তাকে নাক দিয়ে ঠেলছে, থাবা দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। বেশ জমে গেছে। পিঙ্কাকে যখন খেলায় পায়, তখন তার মুখটা বেশ দুষ্টু-দুষ্টু হয়ে ওঠে। এখন সেই মুখ। আমি যেই তাকিয়ে একটু হেসেছি, আমাকে ধমকে উঠল।

এ-দৃশ্য দেখে চুপ করে থাকা যায় ? মা আমাকে যদিও বলেছে, 'বুড়ো, থেকে থেকে আচমকা ষাঁড়ের মতো চেঁচাবি না', তবু আমি চিৎকার করে উঠলুম, "মা, শিগগির দেখবে এসো।"

পিঙ্কা আবার আমাকে ধমকে উঠল। থাবা দিয়ে বেড়ালটাকে বলের মতো ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেছে। মা ছুটে এসেছে। ভেবেছে, কোনও বিপদ-আপদ হল বুঝি। বাবাও দৌড়ে এসেছে। দু'জনেই অবাক। পিঙ্কা কোলের কাছে বেড়ালটাকে নিয়ে বসে আছে। বসে হ্যা-হ্যা করছে।

বাবা বললে, "আহা, কী উপাদেয় দৃশ্য। আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য ! যেন

ঋষির তপোবন, কৃষ্ণের বৃন্দাবন !"

"বাবা, তুমি আজ অফিস যাবে না ? ক'টা বেজেছে দেখেছ ?"

বাবা ঘড়ি দেখে বললে, "তুই স্কুলে যাবি না ?"

"আজ আমাদের ছুটি ।"

"ছুটি কেন ? আজ আবার কিসের ছুটি ?"

"স্পোর্টস ।"

"তোর যখন ছুটি, আমিও একটা সি· এল· মেরে দি । রোজ-রোজ অফিস গেলে নিজেকে কেমন যেন ক্রীতদাস-ক্রীতদাস মনে হয় । কী রকমের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বল তো । কিছুই তো বুঝি না ।"

"তোমার কিন্তু এ-মাসে আজ নিয়ে তিন দিন ছুটি হয়ে যাবে ।" মায়ের সব হিসেব থাকে ।

"তা হলেও ছ' দিন পাওনা থাকবে ।"

"বাবা, তা হলে ছুটি তো ?"

"ছুটি, ছুটি । গরমাগরম রুটি । তুই আমার মনোবল ভেঙে দিয়েছিস । একা-একা অফিস যেতে ভাল লাগে ? থার্ড ক্লাস একটা নিরানন্দ জায়গা । পাঁচটা যেন আর বাজতেই চায় না । সব অফিস যদি উঠে যেত, বেশ হত ।"

"তা হলে রোজ হরিমটর হত," মা মনে করিয়ে দিলে ।

"জানো, আমিও একদিন স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করব । প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হয়ে গেছে । একদিন দেখবে, বিশাল একটা লরি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । তুমি অবাক হয়ে বলবে, 'ও মা, এ কী ! তোমাকে আমি কয়লার দোকানে একমণ কয়লার কথা বলে আসতে বললুম, এ যে দেখছি গোটা একটা লরি পাঠিয়ে দিয়েছে !' আমি তখন মুচকি মুচকি হাসব । ততক্ষণে লরির পেছন দিকটা খুলে দিয়েছে । ঝরঝর করে কয়লা পড়ছে । রাস্তায় একটা কয়লার পাহাড় তৈরি হয়ে গেল । বেলচা মেরে মেরে সব কয়লা বাগানে তুলে দিল ।"

বাবা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে খুশি-খুশি মুখে, আধবোজা চোখে বলে যাচ্ছে ।

মা বললে, "পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে এক লরি কয়লা ?"

"আহা, শোনোই না। প্ল্যানিংয়ের সময় গণ্ডগোল করতে নেই। বাগানের একপাশে একটা কয়লা আর চ্যালা কাঠের দোকান করব। বিশাল বড় একটা দাঁড়িপাল্লা ঝুলবে। ঘণ্টার মতো দেখতে বড়-বড় বাটখারা। দু'তিনটে মাঝারি মাপের বেলচা। দোকানটার নাম দেব, 'মুক্তির মন্দির'। একটা বাঁশের মাচা তৈরি করাব, তার ওপর চট বিছিয়ে আমি বসব। পরনে পাজামা আর গেঞ্জি। সামনে একটা পালিশ করা কাঠের ক্যাশবাক্স। দোকান খোলার সময় সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা, ওদিকে বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। চারপাশে কেষ্টকলি গাছ, মাঝখানে কয়লার পাহাড়, আর একপাশে চ্যালা কাঠ। একটা বড় হাতুড়ি। সারাদিন কয়লা ভাঙব। ভেঙে বিক্রি করব। কেন বলো তো? আমি ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনেছিলুম। কোনও এক মহিলা কয়লা ভাঙতে ভাঙতে, ইয়া বড় সুপুরির মতো একটা হীরে পেয়েছিলেন। কত হীরে এই রকম উনুনে চলে যাচ্ছে কে বলতে পারে! কে দেখছে! ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, বাড়ি-বাড়ি কয়লা সাপ্লাই দেবার জন্যে একটা ভ্যানগাড়ি, সাইকেল ভ্যান, কিনব। সব কাজ আমি নিজে করব। বড়জোর ছোটখাটো একটা ছেলে রাখব। বেশ হাসিখুশি। জানো তো, এক ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার কালো জিনিসের ব্যবসায় প্রভূত অর্থোপার্জন হবে।"

মা বললেন, "ডাক্তারবাবু বলেছেন?"

"ওই হল, ডাক্তারবাবু নয়, বলেছেন এক জ্যোতিষী। ভুল হয়ে গেছে।"

আমি মনে-মনে ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখলুম। মন্দ হবে না। কয়লার ব্যবসাটা বাবা যদি জমিয়ে তুলতে পারে, আমি তা হলে বড় হয়ে একটা কেরোসিনের ডিপো করব। খুব ডিম্যান্ড। কী লাইন পড়ে তেল নেবার জন্যে। পরে যখন আরও পয়সা হবে, তখন একটা পেট্রল পাম্প করব। পেট্রল পাম্পের বাড়িগুলো খুব সুন্দর হয়! চারপাশ কেমন বড়-বড় কাচ দিয়ে ঘেরা। সুন্দর রং করা। সারাদিন রং-বেরঙের গাড়ি আসে। পেট্রলের গন্ধটাও কী সুন্দর! গায়ে সেন্টের বদলে পেট্রল মাখলে কেমন হয়!

বাবা উঠে দাঁড়াল। এইমাত্র যেন স্বপ্ন ভাঙল। চারপাশে তাকিয়ে বললে, "আজ তা হলে ছুটি! আঃ, কী ভাল যে লাগছে? চল বুড়ো, আমরা একটু আশ্রম থেকে বেড়িয়ে আসি। ওখানে গেলে মনটা ভীষণ ভাল হয়ে যায়।"

মা বললে, "বুড়োর লেখাপড়া নেই?"

"থাকবে না কেন? আমারও লেখাপড়া আছে। কত হোমটাস্ক আমার বাকি আছে জানো?"

"তোমার হোমটাস্ক?"

"তুমি জানো না। সে খুব গোপন ব্যাপার। আমার বাবা ছিলেন আমার শিক্ষক। এমনই তো তাঁর খুব একটা সময় ছিল না, চলতে-ফিরতে, কথা বলতে-বলতে আমাকে পড়াতেন। ধরো, তেল মাখতে মাখতে টেন্‌সটা শেখানো হয়ে গেল। প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পার্টিসিপ্‌ল। মনে আছে, তোমাকে কীভাবে অঙ্ক শেখাতেন খেতে বসে? ছেলেবেলায় বাবা আমাকে যত হোমটাস্ক দিতেন, সব তো আর করা হত না। ফাঁকি মেরে দিতুম। বাবা তো কখনও আমাকে বকতেন না। তাঁর শাসন করার কায়দাটা ছিল অন্য রকম। শুধু বলতেন, 'যা বললুম করলি না', বলে তাকিয়ে থাকতেন। মোটা কাচের চশমার আড়ালে বড়-বড় চোখ। হঠাৎ দেখা যেত দু'গাল বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে। উঃ, তখন যা কষ্ট হত! ভেতরটা কেমন যেন হয়ে যেত।"

এইবার মা বসে পড়ল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আমিও বসে পড়লুম। বাবাও আবার বসে পড়ল। পিঙ্কা ঘুমোচ্ছে। পিঙ্কার কোলের কাছে পুশটা বাচ্চা ছেলের মতো অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দক্ষিণের দেওয়ালে আমার দাদির ছবি জ্বলজ্বল করছে। কপালে চন্দনের ছোট্ট একটা ফোঁটা। আঃ কী মজা! আজ ছুটি!

মা বললে, "কত কথাই যে মনে পড়ে! আমার জোরে-জোরে কথা বলা চিরকালের স্বভাব। তা আমাকে একদিন বললেন, 'মা, তুমি একটু আস্তে কথা বলা অভ্যাস করো। তোমার এত গুণ, শুধু এইটুকু শোধরাতে পারলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে যায়।' তা আমি চেষ্টা করতুম; কিন্তু স্বভাব

যাবে কোথায় ! একদিন খুব জোরে-জোরে শিখার মায়ের সঙ্গে কথা বলছি, উনি ঘরে বসে নোট লিখছিলেন । আমি পরে চা নিয়ে গেছি । আমার দিকে তাকালেন । সেই বড়-বড় চোখ । হঠাৎ দেখি ফোঁটা-ফোঁটা জল । জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হল বাবা ?' খুব ধীর শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি পারলে না !' উঃ, সেদিন আমার ভেতরটা যে কী করে উঠেছিল !"

"আমার জীবনে ওই রকম ঘটনা যে কত ঘটেছে ! ছেলেবেলার মজা কী জানো তো, লেখাপড়া ছাড়া সবই করতে ইচ্ছে করে ; অথচ দ্যাখো, ছেলেবেলায় না পড়লে, সময় তো আর সারাজীবন ছেলেবেলায় তোমার সুবিধের জন্যে আটকে থাকবে না । তোমাকে টানতে টানতে ঠিক বুড়োবেলায় এনে ফেলে দেবে । সময়ের তো দয়ামায়া নেই ? সময় হল সময় । এমন এক পথিক, যে-কোনও দিন গাছতলায় বসে দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে জানে না । তুমি তার সঙ্গে চলতে পারো ভাল, না পারলে সময় তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে । এইটা যদি ছেলেবেলায় বুঝতে শিখতুম, তা হলে আরও কত ভাল ছেলে হতে পারতুম । ভাল ছেলে হলে আজ আমি ভাল বুড়ো ।"

"তুমি এখনও কি হোমটাস্ক করো বাবা ?"

"জানিস, আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি । যতদিন একজন ছাত্র, ততদিন বেঁচে থাকায় খুব সুখ । বাঁচার একটা কারণ থাকে । আমি শিখছি, আমি কত কী জানতে পারছি, পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে । এক-একটা দিন আসছে আর বেকার চলে যাচ্ছে, তা নয় । প্রতিদিন আমি বাঁচছি কিছু-না-কিছু শেখার জন্যে । প্রতিদিন আমার মনে হচ্ছে, আরও কিছুদিন বাঁচি, আরও কিছু শিখে যাই । আমি এখনও আমার বাবার ছাত্র । তিনি প্রতিদিন আমাকে হোমটাস্ক দেন । অঙ্ক, ইতিহাস, ইংরেজি, ভূগোল । আমার রুটিন আছে, খাতা আছে, বই আছে, পেনসিল আছে, ইরেজার আছে, জ্যামিতির ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স আছে, এমনকী ছোট একটা টিফিন বক্স আছে । সেই বাক্সে আমার মা এখনও খাবার ভরে দেন, আর মনে করিয়ে দেন, 'টিফিনে মনে করে খাস বাবা' । আমার যে কত সুখ, সে আমি বোঝাই কী করে ! আমার সব আছে, কিছুই হারায়নি ।"

তোমার স্কুলটা কোথায় বাবা ?"

"আমাদের চিলেকোঠায়।"

"সেখানে দেওয়ালে আমার ছেলেবেলার স্লেটটা তাই তুমি যত্ন করে ঝুলিয়ে রেখেছ ?"

"ওইটা আমার ব্ল্যাকবোর্ড।"

মা বললে, "তাই তুমি রাত একটা-দুটো অবধি ছাদে থাকো ?"

"থাকবো না! তখন যে আমার স্কুল চলে।"

"তোমার পরীক্ষা হয় বাবা ?"

"খুব হয়। উইকলি, মান্থলি, কোয়ার্টারলি, হাফ-ইয়ারলি, অ্যানুয়াল। এবারের হাফ-ইয়ারলিতে মাত্র একটা নম্বরের জন্যে আমি ফার্স্ট হতে পারিনি।"

"তুমি কবে বড় হবে বাবা ? কবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকবে ?"

"না রে, সারা জীবন আমি স্কুলেই পড়ব। কেন জানিস তো, স্কুলেই মানুষের জীবনের ভিত তৈরি হয়। শিক্ষকমশাইদের খুব কাছাকাছি থাকা যায়। কলেজ হল পাকা ছেলেদের ক্লাব। আমি পাকতে চাই না। সারা জীবন আমি স্কুলের শিশুটি হয়ে, কিশোরটি হয়ে থাকতে চাই। বড় হওয়াটাকে কত কষ্ট করে আগলে রেখেছি জানিস ? পাকা-পাকা লোক দেখলে আমি পালিয়ে আসি। ভয় করে। পরচর্চা করবে। টাকাপয়সার কথা বলবে। বিষয়-সম্পত্তির কথা বলবে। লোভের কথা বলবে। এই হল না, ওই হল না বলে মনটাকে একেবারে বিষিয়ে দেবে। আমার বাবা বলতেন, বিষয়ী লোকদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করবে। মন হল একটা থলে। তাতে তুমি হীরে, জহরত রাখতে পারো, আবার ইটপাটকেলও রাখতে পারো। তখন তো তাঁর কথা শুনিনি। যেসব কথা শুনিনি, এখন অক্ষরে অক্ষরে সেই সব কথা শোনার চেষ্টা করি। যত দিন ছাত্র থাকতে পারব, ততদিনই সুখ।"

বাবা জামাকাপড় পরতে শুরু করল। মা বললে, "এখন আবার ধরাচূড়ো পরে চললে কোথায় ?"

"বুড়োটাকে নিয়ে এক পাক ঘুরে আসি। রোজ তো আর এই সময়টা আমার থাকবে না। অফিস বলে একটা কারাগার আছে, সেইখানে যমের মতো কিছু মানুষ আছে, যারা কফিনে কফিনে মৃত সাজিয়ে রাখে, তাদের

হাতে দিয়ে আসতে হয়। বুঝলে, অফিস হল মর্গ। দিনের ডেডবডি সাজানো থাকে।"

আমাদের বাড়ির পেছন দিয়ে নির্জন একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আমাদের বাড়িটার ভারী মজা। সামনেটা শহর। পেছনটা গ্রাম। বড়-বড় মাঠ আছে। জোড়া-জোড়া পুকুর আছে। চালাবাড়ি আছে। এক পাশে গঙ্গা আছে। কিছুটা এগোলেই সেকালের বড়-বড় বাগানবাড়ি। প্রাচীন মন্দির। আশ্রম। কী যে সুন্দর! বাবা থেকে-থেকে বলে, 'রাজা, রাজা।'

বাড়ির বাইরে এসে বাবা জোরে-জোরে নিশ্বাস নিল বারকতক, "ফুলের গন্ধ পাচ্ছিস বুড়ো?"

"পাচ্ছি। কী ফুল বলো তো?"

"কাঠচাঁপা। অসাধারণ গন্ধ। দেখেছিস, ফুল কখনও ফেল করে না। মানুষ কিন্তু করে।"

আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে জোড়া পুকুরের ধারে চলে এলুম। পাশাপাশি যেন দুটো আয়না পড়ে আছে। আকাশ তাতে মুখ দেখছে। গাছ চান করতে নেমেছে।

"জানিস বুড়ো, এই দিকটায় এলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কী বাতাস বইছে বল তো এদিকে?"

"কী বাতাস বাবা?"

"বুঝতে পারছিস না? সুবাতাস। তুই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত পড়িসনি!"

"আর একটু বড় হই, তারপর তো পড়ব।"

"এখন তা হলে কী পড়বি?"

"পড়ার বই, গল্পের বই, কমিকস।"

"না না, হল না। এই বয়েস থেকেই তো কথামৃত পড়বি, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়বি। গাছ যখন ছোট থাকে তখনই তার গোড়ায় সার দিতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে, শেকড় মাটির গভীরে চলে গেলে তখন আর ভাবনা নেই। গাছ তখন নিজে-নিজেই সারের সার জিনিস সংগ্রহ করে নিতে পারবে। ঠাকুর কী বলতেন, জানিস, মাটির হাঁড়ি যখন

নরম, তলতলে থাকে, কাঁচা থাকে, তখনই তাকে আকার দেওয়া যায়, নকশাটকশা সব করা যায়। পোড়াবার পর যখন সিঁদুরে লাল, ঝনঝনে, খনখনে হয়ে গেল, তখন আর তাতে কিছু করা যায় না। করতে গেলেই ভেঙে যায়। বুঝলি বোকা! অ্যায়সা একটা জীবন বানা, যেন লোকে তোকে একশো বছর, দুশো বছর, তিনশো বছর, পাঁচশো বছর মনে রাখে। তোর ছবি সব ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো থাকে। সব মায়েরা যেন বলতে পারে তাদের ছেলেদের, ওই ওঁর মতো হও। ভাবতে পারিস, শ্রীচৈতন্য আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে সেই দূর কোন্ নবদ্বীপে জন্মেছিলেন। আজও তাঁকে সারা পৃথিবীর মানুষ পুজো করে। বিলেতের মানুষ মায়াপুরে ছুটে এসে সন্ন্যাসী হচ্ছে।"

"বাবা, আমি কী হব বলো তো? কী হলে ভাল হয়?"

"চাকরিবাকরি করিসনি, দাসত্ব। আমার বাবা চাকরিকে খুব ঘেন্না করতেন। তুই খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখে সন্ন্যাসী হয়ে যা। স্বামী বিবেকানন্দের মতো একটা শরীর তৈরি কর। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত পড়ে একটা মন তৈরি কর। তারপর গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়ে সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়া, দাপিয়ে বেড়া।"

সন্ন্যাসী হতে আমারও বেশ ভাল লাগে। এই সুন্দর টকটকে চেহারা। মাথায় পাগড়ি। হাতে একটা মোটাসোটা লাঠি। এক দেশ থেকে আর-এক দেশ। আর-এক দেশ থেকে অন্য আর-এক দেশ। আমি ঘুরছি। বক্তৃতা করছি। সবাই আমাকে মহারাজ মহারাজ বলছে। কী মজা! আমি বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে আর দশটা-পাঁচটা করব না। সন্ন্যাসীই হয়ে যাব। আমার দাদি বলে গেছেন, "বুড়ো, বাড়িটিকে আশ্রমের মতো করে রাখবি।"

কী একটা বলতে যাচ্ছি, বাবা বললে, "চুপ! ওই দ্যাখ, গাছের ডালে মাছরাঙা কেমন স্থির হয়ে বসে আছে। একেই বলে সাধনা।"

"কিসের সাধনা বাবা?"

"মাছের সাধনা। দ্যাখ না কী হয়।"

মাছরাঙা সত্যিই রাঙা পাখি। হঠাৎ সাঁ করে জল ছুঁয়ে উড়ে গেল। ঠোঁটে একটা রুপোলি মাছ লটপট করছে। কী সুন্দর কায়দা!

আমরা যখন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলুম, মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছে। কাচের মন্দির। চূড়াটা আকাশে গিয়ে মণির মতো জ্বলছে। ভেতরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদা মায়ের মূর্তি পাশাপাশি। পেছনে ত্রিনয়নী মা হাসছেন। একেবারে গঙ্গার ধারে। ঝাঁকড়া চেরি গাছের ডালে-ডালে ছোট-ছোট ঘণ্টা বাঁধা। বাতাসে দুলছে আর টুংটাং শব্দ করছে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যে ঘরে বসে সাধনা করতেন, বাগানের দিক থেকে সেই ঘরের দেওয়ালে হাত রেখে বাবা বললে, "জানিস তো, তিনি যখন সাধনা করতেন, তখন এই ঘরের দেওয়ালে হাত রাখা যেত না। হাত পুড়ে যেত। দেওয়ালে চিড় ধরে যেত। কী সুন্দর! বল্ বুড়ো! সাধন-ভজন জিনিসটা কী সুন্দর! আমার কোনওদিন পয়সা হলে একটা মন্দিরা আর একজোড়া কাঠখত্তাল কিনব, আর সকাল-সন্ধে আমাদের বাগানে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বসে তুলসীদাসের মতো রামনাম করব। করতে করতে রামচন্দ্র একদিন আমাকে এসে দেখা দেবেন। পাশে মা-সীতা আর লক্ষ্মণ ভাই। আমি তখন আর পৃথিবীর কাউকে পরোয়া করব না। চাকরি নয়, বাকরি নয়। বড় কর্তা নয়, ছোট কর্তা নয়। শুধু গাইব, 'ভবে সেই সে পরমানন্দ যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে।' লাভ লোকসান পাওয়া না-পাওয়া খাওয়া না-খাওয়া..."

বাবার চোখে জল এসে গেছে। হু হু করে জল ঝরতে লাগল দু'গাল বেয়ে। সকালের আশ্রম, বে-বার তাই বিশেষ কেউ নেই। তা না হলে বাবাকে কাঁদতে দেখে লোকে কী ভাবত! ভাবত, আমি একটা বদ ছেলে, বাবাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। লেখাপড়া করি না। একটা জানোয়ার। ঠিক এই সময় একটা কাঠবেড়ালি ফোলা লেজ আরও ফুলিয়ে, পিড়িক-পিড়িক শব্দ করতে করতে গাছের গুঁড়ি বেয়ে একবার উঠতে লাগল, একবার নামতে লাগল। কী তার আনন্দ!

বাবা কাঠবেড়ালি ভীষণ ভালবাসে। খুব প্রিয় প্রাণী। আমাকে প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প বলে। তিনি ছিলেন প্রায় সন্ন্যাসীর মতো। বাগানে বসে থাকতেন, আর কাঠবেড়ালিরা তাঁর এ-কাঁধে ও-কাঁধে লেজ উঁচিয়ে খেলে বেড়াত। মাথায় পাখি এসে বসত। নাকের ডগায় উড়ে আসত প্রজাপতি। আমাদের বাগানেও কাঠবেড়ালি আছে। বাবার

একদিন সে কী অভিমান ! "আমার কাঁধে কেন কাঠবেড়ালি উঠছে না ! ওই তো গাছে-গাছে অত পাখি, আমার মাথায় কেন বসছে না !"

মা বললে, "কী আশ্চর্য ! ওরা যদি না বসে, আমি কী করতে পারি ?"

বাবা বললে, "আমার মনে একটুও হিংসে নেই। আমি একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত মারি না। ওরা কেন আমাকে ভয় পাবে ! আর আমি কী করতে পারি। রোজ আমি ওদের জন্যে জল রাখি, ফল রাখি, বাদাম রাখি। এর চেয়ে বেশি আর আমি কী করতে পারি !"

অভিমানে বাবা সেদিন কাঁদো-কাঁদো। শেষে মা বোঝালে, সেকালের পাখি, কাঠবেড়ালি আর একালের পাখি আর কাঠবেড়ালিতে অনেক তফাত। মানুষও বদলেছে, ওরাও বদলেছে। কেন তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করছ ! অতি কষ্টে মা সেদিন বাবাকে বুঝিয়েছিল। তা না হলে ওই নিয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। মা বলে, 'তোর বাবা তোর চেয়েও ছেলেমানুষ। কাঠবেড়ালি কেন গায়ে উঠছে না, এই নিয়ে কেউ কখনও মাথা খারাপ করে ?"

সেই কাঠবেড়ালি বাবার থেকে মাত্র তিন হাত দূরে গাছ বেয়ে একবার করে উঠছে আর একবার করে নামছে। বাবা অবাক হয়ে দেখছে। মুখে-চোখে একটা অন্যরকমের ভাব এসে গেছে। জানি বাবা কী ভাবছে। ভাবছে কাঠবেড়ালিটা এবার হয়তো পা বেয়ে উঠে কাঁধে চেপে বসবে। এত কাছে যখন আসতে পেরেছে, আর একটু কাছে এলে ক্ষতি কী ! শেষ পর্যন্ত এল না। পিড়িক-পিড়িক করে লেজ তুলে পাঁচিলের মাথার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দূরে আরও কোনও বড় কাজে চলে গেল। কাঠবেড়ালিদের কাজের শেষ আছে ?

বাবা আমার দিকে মুখটা কেমন যেন করে তাকাল। বললে, "দেখলি, কাণ্ডটা একবার দেখলি ? এসেও এল না।""

"ও যে এখন ভীষণ ব্যস্ত আছে বাবা। জানোই তো, সকালে ওদের অনেক কাজ থাকে। দেখলে না ওর বাবা ওদিক থেকে পিড়িক-পিড়িক করে ডাকল। ওর কী দোষ বলো !"

আমরা দু'জনে গঙ্গার ধারে নাটমন্দিরে এসে বসলুম। চারপাশ খোলা। সামনে গঙ্গা। হুহু করে বাতাস বইছে। কাঁচাপাকা বাতাস। একটু একটু

গরম, একটু একটু ঠাণ্ডা। চুর চুর করে সোঁদাল ফুল ঝরে পড়ছে সামনের সিমেন্ট বাঁধানো উঠোনে। আমার ভীষণ দাদির কথা মনে পড়ছে। আমি যখন আরও ছোট ছিলুম তখন এই আশ্রমে দাদির হাত ধরে প্রায়ই বেড়াতে আসতুম। পাশের খোলা মাঠটায় একটা ঢিবি ছিল। দাদি ভীষণ পাহাড় ভালবাসতেন। আমাকে কত পাহাড়ের গল্প বলতেন। যেসব পাহাড়ে তিনি উঠেছেন। কী দারুণ চেহারা ছিল দাদির। সোজা, খাড়া। কখনও বেঁকে বসতেন না। আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'বুড়ো, কখনও সামনে ঝুঁকে বসবি না। মেরুদণ্ড সবসময় স্ট্রেট রাখবি। মানুষের স্বাস্থ্য মেরুদণ্ড। যত ধনুক হবি, দুর্বল হয়ে যাবি তত। দাদি আমাকে যা, যা বলতেন সব আমি মনে করে করে এখন খাতায় লিখে রাখছি। যে যাই বলুক, আমি আমার দাদির হাত ধরে আছি। এখনও ধরে আছি। আমি আকাশকে বলি, সেই হাত ছাড়িয়ে দিও না। মেঘে যে চাঁদ ভাসে, তাকে বলি। আমি গাছকে বলি। পাখিকে বলি। আমি গঙ্গাকে বলি।

আমাদের চোখের সামনে গঙ্গা যেন টলটলে হাসি। বাবা সোজা হয়ে বসে আছে। যেমন করে মানুষ ধ্যানে বসে।

হঠাৎ বললে, "বুড়ো, লেখ তো, লিখে নে।"

"বাবা, আমার কাছে তো কাগজ-কলম নেই।"

"মনের পাতায় স্মৃতির কলম দিয়ে লেখ।"

"বলো।"

"সৎ হতে হবে। কাজে, কথায়, চরিত্রে। লিখেছিস ?"

"লিখেছি।"

"এবার লেখ, নিজেকে ধরতে আর ছাড়তে শিখতে হবে। লিখেছিস ?"

"ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে ?"

"অফ কোর্স। ঘুড়ি, লাটাই আর সুতো। মন হল ঘুড়ি, সুতো হল ইচ্ছে আর বিচার হল লাটাই। মন ঘুড়ি উড়তে চাইছে, বাড়তে চাইছে। ইচ্ছের সুতো ভল-ভল করে ছাড়ছি। কোন্ আকাশে, কোন্ বাতাসে ভেসে গিয়ে, কোন বিপাকে পড়বে কেউ জানে না। অমনি বিচারের লাটাই ঘুরিয়ে তাকে টেনে আনো। এটা বোধহয় তোর পক্ষে একটু শক্ত হয়ে গেল।"

"না গো, অনেকটা এই রকম কথাই দাদি আমাকে বলতেন।"

"তবে আর কী ! তুই তো অনেকটা এগিয়েই আছিস । নে লেখ । মা হিংসি ! হিংসা কোরো না । লেখ, সামনে তাকাও । পেছনে যা রইল, পেছনেই পড়ে থাক । এইবার লেখ, দেহের মাপে মন তৈরি কোরো না । মনের মাপে দেহ তৈরি কোরো ।"

"একটু শক্ত হয়ে গেল বাবা ।"

"কিচ্ছু শক্ত হয়নি । শক্ত শব্দটা বোকাদের অভিধানেই থাকে । তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি । তার আগে লেখ, ভুলে যাব । শক্তির চেয়ে বুদ্ধি বড় । লিখেছিস ?"

"ইয়েস ।"

"এইবার শোন, দেহের মধ্যে মন থাকে তো ! থাকে কি না ?"

"হ্যাঁ, থাকে ।"

"পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি, পাঁচ ফুট আট, পাঁচ দশ, বড় জোর ছ' ফুট, এই তো দেহের মাপ । মনটা ওই কুলফি বরফের খোপের মাপে জমে যেন না যায় । মন হবে দৈত্যের মতো, পাহাড়ের মতো গর্জন গাছের মতো । বিশাল । আর সেই মনকে ধরার চেষ্টা করবে দেহ । মন বলবে চাঁদ ছোঁও, দেহ ছুঁয়ে আসবে । মন বলবে এভারেস্ট ধরো, দেহ ধরে ফেলবে । দেহ তখন ছ'ফুট নয়, ছ' মাইল ছ লক্ষ মাইল । বুঝলি ?"

"ক্লিয়ার ।"

"পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে । মনে আছে ?"

"আছে ।"

"খাতা বন্ধ কর । শোন বুড়ো, ভেতরটা বড় ছটফট করে । তোর করে ?"

"সময় সময় করে ।"

"কেন করে ?"

"মনে হয় রোজই কী রকম দিনটা রাত হয়ে যায় ।"

"হাত মেলা । ধরে ফেলেছিস । দুঃখটা ধরে ফেলেছিস । কী যন্ত্রণা বল তো ! সবকিছু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে । আজ যা জন্মাচ্ছে, কাল তার মৃত্যু হচ্ছে । কী করা যায় বল তো ?"

"তুমি আর কী করবে বাবা ? কেউই তো কিছু করতে পারল না । এই

দ্যাখো না, দু'বছর আগেও তো এমন দিনে দাদি ছিলেন। আমরা চারজন ছিলাম, আজ তিনজন। বলো, ভাল লাগে ?"

"ধুস কিছুই কি ছাই ভাল লাগে !"

"চলো, এবার তা হলে বাড়ি যাই। মা একলা আছে। পুশটা কী করছে, পিঙ্কা কী করছে ?"

"চল তা হলে। এই একটা-দুটো ভাল লাগা নিয়েই তো বেঁচে থাকা।"

যতই রোদ চড়ছে, চারপাশ জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, ততই বাবার আনন্দ হচ্ছে। কেবলই বলছে, 'উঃ কী উত্তাপ ! এত তাপ সূর্যদেব পেলেন কোথা থেকে।' মাঝে-মাঝে ধুলো উড়ছে। শুকনো পাতা গোল হয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার নেমে আসছে। বাবা বললে, "বুঝলি বুড়ো, আজ আমরা বাগানটাকে আরও সুন্দর করব। মাঝখানটাকে গোল করে খুঁড়ে ফেলব। ফেলে তাতে জল ঢালব। তলায় ছোট-ছোট নুড়ি পাথর দেব। ধারে ধারে নয়নতারা গাছ। ফোয়ারা তো আর করতে পারব না। সে তোমার অনেক অনেক টাকার ব্যাপার। দুপুরে ওই জলে পাখি এসে চান করবে। তুই দেখতে পাবি। আমি তো আর দেখতে পাব না। আমার সারাটা দিনই তো আটকে থাকবে কলকাতার এঁদো একটা অফিসে।"

"বাবা, তোমার চাকরি করতে খুব খারাপ লাগে, তাই না ? তা হলে করো কেন ?"

"তোদের জন্য। আমি চাকরি না করলে, তুই বড় হবি কী করে ?"

॥ ২ ॥

শ্যামল খুব বড়লোকের ছেলে। বড়-বড় কথা বলে। স্কুল ইউনিফর্ম পরে খুব দামি কাপড়ের। গায়ে আবার সেন্ট মাখে। কাছে সবসময় একশো, দুশো টাকা রাখে। আমরা সবাই জানি, ওর বাবা সৎ নয়। দু' নম্বরি কারবার আছে। আমরা অনেকেই ওর সঙ্গে মিশি না। আমাদের ঘেন্না করে। অনেকে আবার খুব মেশে। বড়লোকের ছেলে, ভাল খায়দায়, তাই দেখতে একটু বড়সড়। অনেকে আবার দাদা বলে। শ্যামলদা, শ্যামলদা বলে আদিখ্যেতা করে।

সেদিন স্কুল ছুটির পর শ্যামল বললে, "বুড়ো, একটা বিলিতি সিগারেট খাবি ?"

শুনে আমি হাঁ হয়ে গেলুম, "তুই সিগারেট খাস ?"

"কেন খাব না ! বিলিতি সিগারেটের দাম জানিস ? পঁচিশ টাকা প্যাকেট। আমার বাবা ডেলি চার প্যাকেট ওড়ায়। আমরা তো সবাই মিলে রাতে বিলিতি বিয়ার খাই। মডার্ন হতে শেখ বুড়ো। মডার্ন হতে শেখ। তোর বাবা একটা চাষা, তুইও একটা চাষা।"

"শ্যামল, মুখ সামলে। ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ। পয়সার গরম বাড়িতে দেখাস।"

আমি প্রস্তুত ছিলুম না। আচমকা এক ধাক্কা মারতেই ছিটকে পড়ে গেলুম। থেঁতো হয়ে গেল নাকটা। ওপর-ঠোঁটটা কেটে গেল। রক্ত গড়িয়ে জামার বুকের কাছটা ভিজে গেল।

শ্যামল হ্যাহ্যা করে হাসতে হাসতে বললে, "ব্যাটা চামচিকে।"

আমি কিছুই করতে পারলুম না। শ্যামল আর তার মোসায়েবরা রাক্ষসের দলের মতো হ্যাহ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমার যারা বন্ধু, আমাকে যারা ভালবাসে, তারা ছুটে এল।

খোকন বললে, "ইস, তোর ঠোঁটটা কেটে গেছে রে, নাক দিয়েও রক্ত বেরোচ্ছে। চল, ডাক্তারখানায় যাই।"

শ্যামলের ওপর নয়, আমার রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। কেন আমি দুর্বল। রাগ চেপে বললুম, "কোনও দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে ঠিক করে নেব। আমার মতো ছেলের এই রকমই হওয়া উচিত।"

"ওর গায়ে খুব জোর রে ! ভাল-মন্দ খায় তো !"

আমি কোনও উত্তর দিলুম না। বাবা সেদিন আমাকে বলেছে, দেহের মাপে মন নয়, মনের মাপে দেহ করবি। ওই শ্যামলকে আমি দেখে নেব। খুব শিগগিরই দেখব। ওকে আমি আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াব। তবেই আমার নাম বুড়ো।

মা বললে, "ইস, তুই কোথা থেকে এমন কেটেকুটে এলি ? কে করলে তোর এমন অবস্থা !"

আমি চেপে গেলুম। খুব ইচ্ছে করছিল, মা কে সব বলি। বলতে

পারলে মনটা অনেক হালকা হয়ে যেত ; কিন্তু বললুম না। রেখে দিলুম নিজের কাছে। অপমান জমিয়ে রাখতে হয়। সাজিয়ে রাখতে হয় ইটের মতো। দাঁতের বদলে দাঁত। নখের বদলে নখ।

বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে, সব দেখে বললে, "আর কিছু না, রাস্তার কাটাকুটি তো, একটা টেট-ভ্যাক নিবি চল।"

রাস্তায় বেরিয়েই বললে, "মার খেলি ?"

"কী করে বুঝলে ?"

"শার্লক হোমস পড়ে। হোমস বলতেন, প্রবল বিচারবুদ্ধি থাকলে মানুষের আর কিছুর দরকার হয় না। তুই কীভাবে হাঁটিস, তোর স্বভাব আমি জানি। অবজারভেশান। একটা মানুষকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে তার চরিত্রের তিনের-চার ভাগই জানা যায়। তুই শান্ত, ধীর আর সাবধানী। এভাবে তুই পড়ে যেতে পারিস না।"

"আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।"

"একটা ধাক্কা খেলি, তোর এখন কী করা উচিত ?"

"তুমি বলো ?"

"না না, যার-যার সমস্যার সমাধান তার-তার কাছে। এ-রকম অনেক ধাক্কা আসবে। সামলাতে হবে। স্ট্যাণ্ড করতে হবে। দেহে আসবে। মনে আসবে।" বাবা রাস্তার একধার দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ সরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, "দেহের ধাক্কা দেহ দিয়ে সামলাতে হবে। মনের ধাক্কা মন দিয়ে।"

"আমার এই সব কাটাকুটি সেরে গেলে বিশুদার কাছে ব্যায়াম শিখতে যাব। তুমি আমাকে ছোলা আর আখের গুড় কিনে দেবে ?"

"নিশ্চয়। ছোলা, গুড় আর কাঁচা হলুদ খাবি। দেখবি, তোর চেহারা কী হয়ে যায় ; কিন্তু মনের জন্যে কী করবি ?"

"মনটা তুমি নিয়ে নাও।"

"ষোলো আনা দিতে পারবি ?"

"অফকোর্স।"

"হাত মেলা। অবশ্য তার আগে নিজের মনটা ঠিক করতে হবে।"

"তোমার মন ঠিকই আছে।"

"না রে, এখনও একটু কমজোর আছে। ফাটাফুটি আছে। ক্র্যাক আছে। আসলে কি জানিস, আমার এই চাকরিটা আর ভাল লাগছে না। মাথা তুলে বাঁচার মতো সম্মানজনক একটা কিছু পেলে দেখতিস, আমার চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত। স্বাধীন না হলে মানুষের কিছু হয় না। দাস দাসের মতো মন পায়, প্রভু প্রভুর মতো, সাধু সাধুর মতো।"

আমার নাক দিয়ে তখনও একটু একটু রক্ত বেরোচ্ছে। ওপরের ঠোঁটটা ফুলে ঢোল। হাঁটুর কাছে থেঁতলে গেছে। এখনও পা ভাঙতে গেলে লাগছে, জ্বালা করছে। শরীরে লেগেছে ঠিকই, তার চেয়ে বেশি লেগেছে মনে। সেই বিকেল থেকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যতদিন না এর বদলা নিতে পারছি ততদিন শান্তি নেই।

ডাক্তারবাবু যেই জিজ্ঞেস করলেন, "কাটল কী করে ?" বাবা অমনি দুম করে সব বলে দিলেন। লজ্জার কথা। না বললেই ভাল হত। বাবা আবার ভীষণ সত্যবাদী। অকারণে মিথ্যে বলে না। ডাক্তারবাবু স্পিরিট দিয়ে সিরিঞ্জ ধুতে ধুতে বললেন, "আজকাল স্কুল-কলেজ যেন গুণ্ডার আখড়া। ছেলে যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছে, ততক্ষণ আতঙ্কে থাকতে হয়। এই কয়েকদিন আগে আমার ছোট ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিলে। গড়াতে গড়াতে দোতলা থেকে একতলায়। পায়ে প্লাস্টার করে পড়ে আছে।"

ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশান দিয়ে সিরিঞ্জটা সামনের ট্রে তে রাখতে রাখতে বললেন, "তোমাকে এখন দিন কয়েক বেশ ভোগাবে। একেই বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো। লিখে দিচ্ছি, একটু ওষুধ খাও।" তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন যদি আপনি ওই বাঁদর ছেলেটার বাবাকে গিয়ে কম্‌প্লেন করেন, কী বলবে জানেন ! বলবে, বেশ করেছে। এখন ইউরোপ আমেরিকার মতো প্রত্যেককেই আত্মরক্ষার কায়দা শিখতে হবে। এরপর দেখবেন আমাদের প্রত্যেককেই ফায়ার আর্মস ক্যারি করতে হচ্ছে। ভালই হল। বেদান্তের দেশ ভারতের কী অবস্থা ! যাক, যা হচ্ছে হোক। নেতারা বুঝুক। আমি কোনওরকমে আর দশটা বছর কাটিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।"

বাবা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাবেন ! বিদেশে ?"

"না না, বিদেশে নয়, স্বদেশে। নিজ ভূমে। যেখান থেকে আগমন সেইখানেই প্রস্থান। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। খুব শিক্ষা হয়েছে ভাই। এখন ভালয়-ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই। এখন একটু উনিশ-বিশ হলে রুগীরা কী ভাষায় কথা বলে জানেন, মেরে থোবনা উড়িয়ে দেব, মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দেব। বাঙালী মারতে শিখেছে মশাই। বাপকেই ধরে ঠেঙিয়ে দিলে। জ্যাঠামশাইয়ের কাছা খুলে দিলে।"

বলতে বলতেই চেম্বারে এক রুগী ঢুকল। হাতে বালা। গলায় পদক। গায়ে জেব্রা টি-শার্ট। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "কী ওষুধ দিলেন মা কে ? তিন দিন হয়ে গেল জ্বর ছাড়ার নাম নেই। হাতে রেখে চিকিৎসা হচ্ছে ! আপনার মশাই হেভি বদনাম আছে। এইবার একদিন চেম্বার এনে আপনার চেম্বার চৌপাট করে দেব। আসলি মালটা এইবার ছাড়ুন তো। তিন দিন হয়ে গেছে।"

ডাক্তারবাবু বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটু আগে আপনাকে কী বলছিলুম !"

তারপর সেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার মায়ের ভাই টাইফয়েড হয়েছে। সারতে সময় নেবে। আমার বাবারও ক্ষমতা হবে না তিন দিনে সারাবার।"

বাবা ডাক্তারবাবুর সমর্থনে বললে, "টাইফয়েড ভাই মাসখানেক লাগে। কিছু কিছু রোগের একটা মেয়াদ থাকে, যেমন স্মলপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, টাইফয়েড। এ-নিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে চোটপাট চলে না।"

ছেলেটা চোখ বাঁকিয়ে বললে, "থামুন, আপনাকে আর দালালি করতে হবে না।"

ছেলেটার উত্তর শুনে আমার মাথাটা একেবারে চড়াত করে উঠল। আমার বাবাকে অপমান ! যত তাড়াতাড়ি পারি আমাকে বড় হতে হবে। তারপর এদের ধরব আর পেটাব। এই ধরনের কথার একটাই জবাব, নীচের চোয়ালে একটা আপারকাট। ঝুলে হাঁ হয়ে থাক একমাস। বাবা কত ভালভাবে বলতে গেল, তার জবাব হল এই !

ডাক্তারবাবু টেবিলের টানা খুলে একটা একশো টাকার নোট বের করে ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, "এই নাও ভাই, তোমার মা কে আমি তিন দিন দেখেছি। তার মধ্যে তুমি আমাকে একদিন ভিজিট দিয়েছ, দু'দিনের বাকি আছে। আর আমার কথামতো তিন দিন ওষুধ পড়েছে। এই নাও একশো। বেশিই তোমাকে দিলুম। তুমি দয়া করে এসো। তোমার মায়ের চিকিৎসা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।"

ছেলেটা ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে নিল। পকেটে ভরতে ভরতে বললে, "যত ব্যাটা ঘোড়ার ডাক্তার এই পাড়ায় এসে আড্ডা গেঁড়েছে। সব ব্যাটাকে এখান থেকে হটাতে হবে। মেহনতি জনতার পকেট কেটে গাড়ি বাড়ি।"

রাস্তায় আর-একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চিৎকার করলে, "কী হল ওস্তাদ! একটু চমকে দেব?"

"দরকার হবে না। আমি এখনও বেঁচে আছি।" জামার কলারটা দু' আঙুল দিয়ে টেনে একটু উঁচু করে বুক চিতিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে গেল।

বাবা বললে, "এ কী করলেন! টাকাটা দিয়ে দিলেন! এভাবে তো আপনি ডাক্তারি করতে পারবেন না। ভয় পেলে তো চলবে না।"

"ভয় নয়। সেই বাংলা প্রবাদ আছে না, 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল', এ হল তাই। আর আমিও মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছি, বাছা-বাছা দু-একটি ফ্যামিলিতে বছর পাঁচেক প্র্যাকটিস করব, তারপর ছেলের কাছে চলে যাব ফিলাডেলফিয়াতে। আমার চেম্বারে একটা দিন বসলে আপনি যে সমাজচিত্র দেখতে পাবেন, তাতে আপনারও মনে হবে, যঃ পলায়তে স জীবতি। জানেন তো, সেদিন এক রুগীর বাড়িতে আমার সব ছিনতাই করে নিয়েছে।"

"অ্যাঁ, বলেন কী?"

"রাত তখন প্রায় একটা। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল কান্নাকাটি করে। সে প্রায় পায়ে পড়ে আর কি। চিনি না ছেলেটাকে। আর আজকাল কে-ই বা কাকে চেনে! সবই তো নতুন মুখ। পুরনো মুখ হারিয়ে যেতে বসেছে। তারপর দেখলুম রুগীটুগী সব বাজে।

দাসবাগানের কাছে একটা লকআউট ফ্যাকট্রির কাছে নিয়ে গিয়ে যা টাকাপয়সা সঙ্গে ছিল সব কেড়ে নিলে। ঘড়িটা গেল, স্টেথো, ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্রটা গেল। আমেরিকা থেকে ছেলে একটা গোল্ড ফ্রেম এনে দিয়েছিল, সেই চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম অন্ধের মতো। না একটা লোক, না একটা পুলিশ, কেউ কোথাও নেই। বন্ধ কারখানার গেটে পোস্টারের পর পোস্টার। একপাশে একটা ভাঙা রিকশার কঙ্কাল।"

"ছেলেটাকে পরে দেখতে পেলে চিনতে পারবেন না ?"

"ছেলে একটা নয় তো, ছেলে তিনটে। আর চিনলেই বা কী হবে। সাক্ষী কোথায় ! আইন দিয়ে কিছু করতে পারবেন না। সাক্ষীর অভাবে অপরাধী খুন করেও বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসছে জেল থেকে। আইন কিস্যু করতে পারছে না। আমাদের এখন দল চাই। ওই ঘরের কোণে বসে 'গেল গেল' করলে হবে না। তাতে সবই চলে যাবে। সমাজটাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে। আইন দিয়ে, বক্তৃতা করে, নির্বাচন করে, সরকার পালটে, কিছুতেই কিছু হবে না। চারটি জিনিস চাই। চারটে পা। মানুষও চতুষ্পদ প্রাণী। শিক্ষা আর সংস্কৃতি হল দুটো হাত, আর দুটো পা হল, জীবিকা ও স্বাস্থ্য। চরিত্র হল মেরুদণ্ড। তা কে এসব করবে। মেরুদণ্ড বেঁকে ধনুক। হাত দুটো সরু লিকলিকে। দুটো পায়েই পক্ষাঘাত। রিকেটি ছেলেকে তেল মালিশ করে কত আর সুস্থ করা যায় ?"

আমার দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে ডাক্তারবাবু বললেন, "বড় শক্ত সময়ে এসে পড়েছ তোমরা। কী যে হবে ? আমাদের তো যাবার সময় হল, তোমাদের এখনও অনেকদিন টানতে হবে বাবু।"

আমরা দু'জনে রাস্তায় নেমে এলুম। রাত্তিরটা আমার এত ভাল লাগে ! কত দোকান ! কত আলো। কত লোক ? বাবা বললে, "শোন বুড়ো, এই গরমকালে, এমন হাওয়া ফুরফুর রাতে কী কিনতে হয় বল তো ?"

"কী ? বেলফুলের মালা ?"

"না, বালি-বালি কুঁজো, হাতপাখা আর গোলাপজাম। জামরুল আর

ফলসা। চ, ওই তো বাজার ! কিনে আনি। বেশ মজা হবে। মনে হবে আজ বাড়িতে কোনও পুজো আছে।”

“আমার যে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা। তা ছাড়া দাদি তোমাকে বলেছিলেন না, বাজে খরচ করবে না। আমার সেই ইংরেজিটা এখনও মনে আছে, ওয়েস্ট নট, ওয়ান্ট নট।”

“তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুই আমার চেয়েও জ্ঞানী হয়ে উঠেছিস। চল, তা হলে বাড়ি যাই। কী, একটা রিকশা নেব ?”

“না। দাদি বলে গেছেন, কখনও কারও ঘাড়ে চেপে চলবে না।”

“তা অবশ্য ঠিক। তোর মধ্যে আমার বাবা বেঁচে আছেন। চল তা হলে, কদম কদম বাড়ায়ে যা।”

আমরা হাঁটা শুরু করলুম। আমার মনে হয় জ্বর আসছে। কেমন যেন শীত-শীত করছে। আমাদের বাঁ দিকে পার্ক। একটি লোক কেরোসিনের কুপি জ্বেলে ফুচকা বিক্রি করছে। আর তাকে সব গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে। হাতে শালপাতার ঠোঙা। একটা করে পেট-টেপা, জল-ভরা ফুচকা ঠোঙায় পড়ছে আর পুটুস করে মুখে পুরে দিচ্ছে। ছবির মতো দৃশ্য। আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।

বাবা বলে উঠলেন, “জানিস, তুই যে-ই বললি আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার একটা গল্প মনে পড়ল। চল, পার্কে বসে তোকে গল্পটা বলি।”

“পার্কে বসলে দেরি হয়ে যাবে না বাবা ? মা আবার ভাববে।”

“শোন না, মাত্র পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট বসব। কবেই বা আমরা আর পার্কে বসি ! এর পাশ দিয়ে রোজই আমরা যাই আর আসি। ফিরেও তাকাই না। পার্কেরও তো রাগ হয়, অভিমান হয়। ওই ভাঙা বেঞ্চে আমরা বসব। মাথার ওপর আকাশটাকে একবার দেখব। কত তারা কত দূর থেকে আমাদের দেখছে ! তারপর তোকে গল্পটা বলব। তারপর বাড়ি চলে যাব। এর মধ্যে তো ঝামেলার কিছু নেই।”

সারাদিনের রোদে বেঞ্চটা তখনও গরম হয়ে আছে। বাবা ঘাড় উঁচু করে আকাশ দেখছে। সত্যি আকাশটা যেন বিশাল একখণ্ড মিছরির মতো। তারাদের জলসা হচ্ছে। কালপুরুষ পশ্চিমে হেলছে, পেছনে

আসছে তার কুকুর। বাবা গল্পটা শুরু করল। মনের জোরে মহাপুরুষেরা কী না করতে পারেন ? স্বামী অভেদানন্দের জীবনের ঘটনা। তিনি তখন আলমোড়ায়। একদিন বিকেলে আশ্রম থেকে বেরিয়েছেন বেড়াতে। হাঁটতে হাঁটতে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলে গেছেন বহু দূর। সূর্য ধীরে-ধীরে অস্ত যাচ্ছে। এইবার তিনি ফিরবেন। জঙ্গলের পথ। রাতে বাঘ-ভাল্লুক বেরোয়। দ্রুত পা চালিয়েছেন। পথের ঢালুতে হঠাৎ তিনি পা হড়কে পড়ে গেলেন। পড়লেন অনেকটা নীচে। পায়ের সামনের হাড়টা ভেঙে গেল পাথরের ধাক্কায়। বুঝলি বুড়ো, শিনবোনটা ভেঙে, ভাঙা বাখারির মতো ঠেলে বেরিয়ে এল। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। জঙ্গল। পাহাড়। ছোট-বড় পাথর। আর পায়ে-চলা পথ। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। বুঝতেই পারছিস হাড় ভাঙার যন্ত্রণা কী জিনিস ! যে ভাবেই হোক আশ্রমে ফিরতে হবে। কী করবেন ! জয় ঠাকুর। জয় রামকৃষ্ণ। মনটাকে তিনি তুলে নিলেন পা থেকে।”

“তার মানে কী বাবা ?”

“সে একটা যোগ বাবা। মনই তো সব। আমাদের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, সবই তো মন দিয়ে বুঝতে হয়। তুই পিঁপড়ে দেখেছিস তো ?”

“বাঃ, পিঁপড়ে দেখিনি ! আমাদের বাগানে রোজ দুপুরবেলা তো আমি পিঁপড়েই দেখি। সার বেঁধে পিলপিল করে চলেছে। এ-গাছের গোড়া থেকে ও-গাছের গোড়ায়। পিঠে বোঝা নিয়ে। যেন কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীরা চান করতে চলেছে।”

“ওরা চিনির খবর কী ভাবে পায় জানিস ? প্রথমে একটা পিঁপড়ে বেড়াতে বেরোল। এদিক যাচ্ছে, সেদিক যাচ্ছে। ঘুরঘুর করে ঘুরছে। হঠাৎ দেখলে এক জায়গায় একটু গুড় কী চিনি পড়ে আছে। প্রথমে শুঁকে দেখলে জিনিসটা কী। ছোট্ট জিভ বের করে একটু টেস্ট করলে। পুরোটা কিন্তু সে খাবে না। কিছুতেই খাবে না। হাতে পায়ে ধরলেও খাবে না। সে এবার ধড়ফড় করে ফিরে চলল। জানিস তো পিঁপড়ে, মৌমাছি এরা দল ছাড়া কিছু করে না। এইবার সে দেখলে, তার দল সার বেঁধে আসছে। দেখিসনি, এক সার পিঁপড়ে আসছে, আর একটা মাত্র পিঁপড়ে উলটো দিক থেকে আসছে, আর প্রত্যেকের সামনে থেমে থেমে শুঁড়ে

শুঁড়ে কী বলে যাচ্ছে। প্রত্যেককে ওই খবরটা দিচ্ছে। অত অক্ষাংশ অত দ্রাঘিমাংশে খানিকটা চিনি পড়ে আছে। ভাইসব, চলো চলো, জলদি চলো।"

"তুমি ঠিক বলেছ বাবা। প্রত্যেকদিন বাগানে আমি ওই দৃশ্য দেখি। এক সার পিঁপড়ে একদিকে যাচ্ছে আর একটা মাত্র পিঁপড়ে উলটো দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেকের সামনে থামছে আর মাথা-ঠোকাঠুকি করছে।"

"তোর যেটা মাথা-ঠোকাঠুকি মনে হয়েছে, আসলে সেটা ওই এক কথা। ভাইসব, সন্ধান পেয়েছি, তুরন্ত চলো। মনও ওই পিঁপড়ের মতো। সারা শরীরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই কোনও গোলমাল দ্যাখে, অনবরত খবর পাঠাতে থাকে মাথার মূল ঘাঁটিতে। আর আমরা ছটফট করতে থাকি। মন-পিঁপড়েকে ব্যথার জায়গায় না যেতে দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দে, দেখবি অবাক কাণ্ড। ব্যথা নেই, বেদনা নেই, আরাম নেই, সুখ নেই, আনন্দ নেই। বাঁচার কৌশলটা রপ্ত করতে পারলে, পৃথিবীটা কী অপূর্ব জায়গা রে বুড়ো! টেরিফিক জায়গা। শুধু কি জানিস তো, মনটাকে একেবারে হাতের মুঠোয় নিতে হবে। তুই তো এখনও ছোট আছিস, তুই এসব এখনও বুঝবি না। তোকে আমি বলে রাখছি। শুনে রাখ। বলা তো যায় না, আজ আমরা দু'জনে পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছি। এক বছর পরে কে কোথায় থাকব, কে বলতে পারে! এই যেমন ধর, তোর দাদি! এই তো, এই তো সেদিন ছিলেন, আজ আর নেই। জানিস তো, মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবনে একবারই দেখা হয়। তোর দাদি একবারই আমার বাবা হয়েছিলেন। আর কখনও, কখনও আর হবেন না। আমি হুহু করে যতই কাঁদি না কেন। একবার, সবকিছুই একবারের জন্যে।"

"তুমি এইসব বললে আমার খুব কষ্ট হয়, বাবা। তুমি কেন আমাকে এসব বলছ?"

"কেন বলছি জানিস, তোর মনটা শক্ত হবে বলে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, মাটির হাঁড়ি যখন কাঁচা থাকে, সেই কাঁচা অবস্থায় যা কিছু আকার-আকৃতি দিতে হয়। পুড়ে পাকা খনখনে হয়ে যাবার পর আর কিছু করা যায় না। তখন কিছু করতে গেলেই ঠুন্ করে ভেঙে যায়। তোর ওই কাঁচা মনে এখন থেকেই বৈরাগ্যের রং ধরাতে হবে।"

"বৈরাগ্য কাকে বলে বাবা ?"

"সব কিছুর মধ্যে থেকেও না থাকা। কোনও কিছু আঁকড়ে না ধরা। সংসার নিয়ে পাগল না হয়ে যাওয়া। তুই যখন খুব ছোট, তখন পুজোর সময় তোর মায়ের খুব ইচ্ছে হল তোকে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরাবে। অনেক কাণ্ড করে খুঁজে-পেতে নিয়ে এলুম কিনে। পরিয়ে দেবার পর তোর সে কী ডাঁট! এদিক যাচ্ছিস, ওদিক যাচ্ছিস। কেউ হাত দিলে রেগে যাচ্ছিস। খুলে দাও না বললে কেঁদে ফেলছিস। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল সব দলাপাকিয়ে একপাশে ফেলে দিয়ে দিগম্বর হয়ে ঘুরছিস। এর নাম বৈরাগ্য। কোনও কিছুর জন্যেই দুঃখ-সুখ নেই। হল হল, না হল না হল। তুই কথামৃতটা পড় বুড়ো। আর দেরি করিসনি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, সংসারে থাকবি পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল পাঁকে থাকে, গায়ে কিন্তু পাঁক লাগে না।"

বাবা যখন এইসব কথা বলে, মুখ-চোখ খুশিতে আনন্দে যেন ডগমগ করে ওঠে। আমার ভুলও হতে পারে, তবে মনে হয়, বাবার গা দিয়ে যেন ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে। এইসব সময়ে বাবাকে যেন চিনতে ভুল হয়। একবার সেই সিনেমায় দেখেছিলুম, ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করছেন, বলো তুমি কে ? আমারও বাবাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, বলো, তুমি কে ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বাবা বললে, "ভিড়টা কমেছে, ফুচকা খাবি না কি বুড়ো ?"

"না বাবা, তুমি কখনও ফুচকা খেয়ো না। মা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। মা বলে, ওই যে হাঁড়ির মধ্যে তেঁতুল-গোলা জল, ওর মধ্যে সময়-সময় ছুঁচো-ইঁদুর পড়ে। ফুচকা খেয়ো না বাবা। মা বলেছে, বাড়িতে একদিন করবে।"

"অন গড ?"

"অন গড।"

"কী করে করবে ? ওইটুকু লুচি ফোলাবে কী করে ?"

"সে ঠিক ফুলিয়ে দেবে। মায়ের খুব বুদ্ধি আছে। জানো তো, মুখে-মুখে গুণ করে। এই শনিবার ফুচকা করবে।"

"হাত মেলা। আমি পঞ্চাশটা খাব। না, পঞ্চাশটা নয়, পঁচিশটা। তুই ক'টা খাবি?"

"মিনিমাম একশোটা।"

"অত খাসনি বুড়ো। অসুখ করবে।"

"তা হলে তিরিশটা।"

এরপর আমরা উঠে পড়লুম। রাস্তা অনেক নির্জন হয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ির রাস্তায় যোগেনদার দোকানে যখন রসগোল্লা তৈরি হতে শুরু করে, তখনই বুঝতে পারি দিন শেষ হয়ে গেল। বাবা বলে, বছর হল তিনশো পঁয়ষট্টিটা পাখির একটা ঝাঁক। রোজ একটা করে উড়ে পালায়। কোনও খাঁচায় এ-পাখিকে ধরে রাখা যায় না।

॥ ৩ ॥

সেদিন বিকেলে বিশুদার আখড়ায় গেলুম। একটা উঠোন আছে। একপাশে বিশাল একটা কদমগাছ আছে। প্যারালাল বার আছে। রোমান রিং আছে। উঠোনে ব্যায়াম। ঘরের ভেতর যোগ-ব্যায়াম। আরও ওপাশে বেশ বড় একটা ঘেরা জায়গায় জুডো, ক্যারাটে, কুংফু। আমি যেই 'বিশুদা, বিশুদা' করে ঢুকছি, বিকট এক চিৎকার, 'ইয়া হু', পরক্ষণেই ঠাস্ করে একটা শব্দ। বেশ ভয় পেয়ে গেছি। কী রে বাবা! শব্দটা এল ভেতরের ঘেরা জায়গা থেকে। বিশুদার গলা পেলুম, "একসেলেন্ট, একসেলেন্ট।" আমি ভেবেছিলুম, কেউ কাউকে বুঝি মেরে ফেললে। বিশুদার গলা শুনে সাহস পেলুম।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখলুম, বিরাট বড় একটা ম্যাট পাতা। বিশুদা সাদা রঙের ঢোলাঢালা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে আর-একটি ছেলে। তারও পরনে বিশুদার মতো পোশাক। আরও তিন-চারজন একধারে বসে। দু'জন একেবারে ওপাশে দাঁড়িয়ে শূন্যে নানা কায়দায় ঘুসি ছুঁড়ছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। বিশুদা তখন সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির থেকে বেশ কিছু দূরে সরে গেছেন। হঠাৎ একটা শব্দ করলেন, ইয়াপ। ডান পা'টা বিদ্যুৎ-গতিতে উঠেই নেমে গেল, আর দেখি ছেলেটা

ছিটকে পড়ে গেল আর-একধারে। সে কিন্তু পড়ে রইল না। এক পাক গড়িয়েই ঝট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুটে এসে ভীষণ শব্দ করে বিশুদাকে কী একটা করল, বিশুদা ছিটকে পড়ে গিয়েই বললেন, "সুপার্ব, সুপার্ব।"

আমি একপাশে হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছি, আর মনে-মনে ভাবছি, বাবা রে, কী কাণ্ড ! এইরকম মার এক ঘা খেলে আমি আর উঠতে পারব না। ওইখানেই পড়ে থাকব সাতদিন। বিশুদার হঠাৎ চোখ পড়ল আমার দিকে। এতক্ষণ লড়াই করে চোখমুখ একেবারে লাল-টকটকে। পোড়া পেতলের মূর্তির মতো। আমার সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "কী রে, তুই এখানে ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কী হয়েছে ?"

"আমি আপনার কাছে এসেছি। অনেক কথা আছে।"

"কী কথা বল। তোর সব কথা আমি রাখব। তোর দাদু ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু, ব্যায়ামগুরু।"

"আপনার ঘরে চলুন।"

বিশুদা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস। ডোন্ট স্টপ। শরীর গরম করো, গরম করো।" ছেলেরা সঙ্গে-সঙ্গে লাফাতে লাফাতে শুরু করল। শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তে লাগল। কেউ-কেউ ম্যাটের ওপর ডিগবাজি খেতে শুরু করল। আমরা চলে এলুম বিশুদার ঘরে। চৌকির ওপর পুরু করে কম্বল পাতা। দেওয়ালে বিখ্যাত ব্যায়ামবীরদের ছবি। তা ছাড়া, মা কালী, মা দুর্গা। সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ। চতুর্দিকে দেহ সাধনার নানা যন্ত্রপাতি। চৌকির ওপর আবার একটা হারমোনিয়াম। এই ঘরটাই হল বিশুদার রাজত্ব।

আমাকে বললেন, "বোস।"

চৌকির একধারে বসলুম। একটু ভয়-ভয় করছে। বিশুদা সব শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে যদি বলেন, 'বুড়ো, এই শরীরে তোর হবে না রে ! তুই এখন তিন-চার বছর ফ্রি-হ্যান্ড কর,' তা হলেই হয়ে গেল। তিন-চার বছর অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার নেই। ততদিনে আমাদের স্কুল শেষ হয়ে যাবে। শ্যামল বেরিয়ে যাবে। বড়লোক তো, বিলেত-টিলেত চলে যাবে।

বিশুদা ধূপ জ্বালালেন। বিশুদার গুরুর ছবির সামনে ধূপদানিতে ধূপ দুটো গুঁজে দিলেন। সারা ঘর মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল। আমি চুপ করে বসে আছি। দেখছি বিশুদা আর কী করেন। বিশুদাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য। আর তেমনি সুন্দর চরিত্র। লেখাপড়াতেও সাঙ্ঘাতিক ভাল ছিলেন। নিজে ডাক্তার। খুব ভাল ডাক্তার। আমার বাবার কথায়, যার হয়, তার সব হয়। যার হয় না, তার কিছুই হয় না।

ধূপ দেখাবার পর বিশুদা লাল রঙের একটা প্লাস্টিকের কৌটো থেকে ডেলামতো দুটো কী বার করলেন। একটা ডেলা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "মুখে ফেলে দাও।" আর-একটা ডেলা নিজের মুখে ফেলে দিলেন। মুখে দিয়ে বুঝলুম তাল-মিছরি।

বিশুদা চৌকির একপাশে বসে বললেন, "বুঝলে বুড়ো, শরীর থেকে এনার্জি বেরিয়ে যাবার পর একটু মিষ্টি খেতে হয়। তাতে ক্লান্তি অনেক কমে যায়। শরীর স্নিগ্ধ হয়। মিছরি হল সবচেয়ে ভাল মিষ্টি। বিশেষ করে তাল-মিছরি। আর একটু নেবে?"

"না বিশুদা। আর নেব না।"

"বলো, এইবার, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?"

"আমাকে আপনি শক্তি দিন।"

"কথাটা কী রকম যেন হল! তোমাকে আমি শক্তি দেব? শক্তি দেবার মালিক আমি? শক্তি দেবেন ভগবান।"

"আমি আপনার কাছে ব্যায়াম করব। যুযুৎসু, ক্যারাটে শিখব।"

"হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে হল কেন?"

"আমি একটা ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙাব।"

"সে আবার কী?"

"সেই ছেলেটা আমার সঙ্গে পড়ে। বড়লোকের ছেলে। গায়ে খুব ক্ষমতা। অকারণে আমার ওপর অত্যাচার করে। আমি যদি একদিন বেশ করে তাকে ধোলাই দিতে পারি, তা হলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"তুমি সেই ছেলেটার নাম বলো আমাকে। কোথায় থাকে বলো। আমি তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসব।"

“না বিশুদা, ওই কাজটা আমাকে নিজে-হাতে করতে হবে। আমার শক্তি চাই। ওইরকম ছেলে একটা নয়, আরও অনেক আছে।”

“মারের বদলা মার, হিংসার বদলা হিংসা, এটা তো পথ নয়, পথ হল ক্ষমা।”

“তা হলে আপনি এসব শেখান কেন?”

“হুঁ, প্রশ্নটা তুমি ভালই তুলেছ।”

“আমার দাদি আমাকে বলতেন, দ্যাখ্ বুড়ো, অহিংসা, ক্ষমা এসব অনেক উঁচু জিনিস, সকলের জন্যে নয়। পশুরা বুঝবে না। যারা ব্রুট, তাদের দাবাতে হবে শক্তি দিয়ে। তাদের ক্ষমা করতে যাওয়ার মানে হবে দুর্বলতা।”

“হুঁ, তিনি ঠিকই বলে গেছেন।”

“তা হলে আপনি আমাকে শেখান।”

“দেখি, তোমার ডান হাতটা আমার ডান হাতে রাখো।”

আমার ডান হাত দিয়ে বিশুদার ডান হাতটা ধরলুম।

“নাও, এবার চাপ দাও। তোমার যত জোর আছে, সব জোর লাগাও। চাপো। দাও চাপ। জোরে, আরও জোরে।”

আমার যত জোর আছে, সব জোর দিয়ে বিশুদার হাতটা চেপে ধরলুম। আমার দাঁত কিড়ির-মিড়ির করছে।

বিশুদা জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি নিশ্বাস নিচ্ছ?”

“হ্যাঁ, নিচ্ছি।”

“দম নিয়ে, দম বন্ধ করে চাপো।”

তাই করলুম। এক সময় আমার দম ফুরিয়ে গেল। হাত আলগা হয়ে গেল। আমি আর পারলুম না।

বিশুদা বললেন, “গুড। ভেরি গুড। একে বলে জোর চালা। মানুষের জোর, মানুষের শক্তি, যা তুমি অন্যের ওপর প্রয়োগ করতে চাও, তা কখনও তরল, কখনও কঠিন। আর মনের শক্তি হল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। স্পার্ক। জোর এইভাবে ঢেলে দিতে হয়।”

“আমার জোর আছে বিশুদা?”

“হ্যাঁ আছে। দাঁড়াও, তোমার মন দেখি।”

বিশুদা উঠে গিয়ে একটা দড়ি বের করে আমার সামনে ফেলে দিলেন, "নাও, ছিঁড়ে দু'টুকরো করো।"

দড়িটা খুব মোটা নয়। পাটের দড়ি, কিন্তু টেনে দেখলুম বেশ শক্ত। মনে হল ছিঁড়তে পারব না।

"বিশুদা, এ ভীষণ শক্ত। এটাকে দু'টুকরো করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

বিশুদার ফর্সা, সুন্দর, মুখ লাল হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বললেন, "অসম্ভব শব্দটা, বুড়ো, অক্ষমের অভিধানেই পাওয়া যায়। হাঁটু গেড়ে বোসো। দু'হাত দিয়ে দড়িটাকে বুকের কাছে ধরো। ধরে, দম ছেড়ে, দম নিয়ে টানো। মনে-মনে বলো, আমি হারব না। কিছুতেই আমি হারব না। ডিফিট মানে মেন্টাল ডেথ। মানসিক পরাজয়। মন হাজারবার, লক্ষবার পরাজিত হতে-হতে যে চেহারা নেয়, তাকে বলে পরাজিতের মন। ইংরেজিতে বলে, ডিফিটিস্ট মেন্টালিটি। তখন সেই মনের একটাই কথা হয়, এ আমি পারব না। 'আমি পারব না,' এই কথাটা তোমাকে ভুলতে হবে। মনে করো, তোমার ভাষায় ওই শব্দটা নেই। অমন কথা তুমি শোনোনি। নাও, চেষ্টা করো। চেষ্টা করো, চেষ্টা করো।"

বিশুদার গলাটা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল।

দড়িটাকে টেনেটুনে কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। হাতে কেটে বসে যাচ্ছে, তবু ছিঁড়ছে না। দম ফুরিয়ে আসছে। বিশুদা বলেছেন, প্রথমে দম নিবি, নিয়ে ফুলবি। দম ছাড়বি না। তারপর চোখ বুজে একাগ্র হয়ে ছেঁড়ো। ছেঁড়ার চেষ্টা করো। মনে করো, এর ওপর নির্ভর করছে, তোমার বাঁচা-মরা। সেই গল্পটা শোনালেন, ছেলের মাথায় আপেল রেখে তীর মেরে দু'ভাগ করে মুক্তি আদায় করেছিলেন বীর। বললেন, প্রাণভয়ে মানুষ যখন দৌড়য়, তার বেগ তখন ওলিম্পিকের দৌড়বীরকেও ছাড়িয়ে যায়।

চোখ বুজে দম বন্ধ করে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। ভেতরটা এত গরম হয়ে উঠেছে, এক-একবার যখন নিশ্বাস ফেলছি, নাকের কাছে ওপর-ঠোঁটটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। শেষে দড়িটা

মেঝোতে ফেলে দিয়ে আমি কেঁদে ফেললুম। বিশুদা আমার সামনে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, "কী হল বুড়ো ?"

"আমি কিছুতেই পারলুম না বিশুদা।"

"কাঁদছ কেন ?"

"আমি যে ফেল করলুম।"

"ফেল করলে কী হয় ?"

"ফেল করলে লজ্জা করে।"

"আর কিছু করে না ?"

"মনে হয় এক জায়গায় আটকে গেলুম। আর সামনে এগোবার পথ নেই। পরীক্ষায় ফেল করলে বন্ধুরা সব পেছনে ফেলে উঁচু-ক্লাসে চলে যায়। যারা নীচে ছিল, তারা ওপরে এসে ধরে ফেলে।"

"তার মানে, সবাই চলছে, তুমি এক জায়গায় আটকে গেলে।"

"দড়িটা ছিঁড়তে পারলুম না, তার মানে আপনি আর আমাকে শেখাবেন না।"

"কিন্তু আমি তো সহজে ছাড়ি না। তোমাকে দিয়ে দড়িটা আমি ছেঁড়াবই।"

"আমি যে পারছি না বিশুদা। এই দেখুন আমার হাতে রক্ত জমে গেছে।"

"আমি যে ওই রক্তটাই জমাতে চাই। আমি ওই নরম তুলতুলে হাত দুটোকে শক্ত করতে চাই। তুমি ওই দড়িটা বাড়ি নিয়ে যাও। যেদিন ছিঁড়তে পারবে, সেদিন আমার কাছে আসবে।"

আমি মনখারাপ করে বিশুদার আখড়া থেকে বেরিয়ে এলুম। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না, যদি ছিঁড়তে না পারি, তা হলে কি আসব না বিশুদা ? সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। রাস্তায় কত লোক। কেউ এদিকে যাচ্ছে, কেউ ওদিকে যাচ্ছে। আমার মনের কথা কেউ জানে না। মা আমাকে একটা টাকা দিয়েছিল সকালে। সামনেই মা কালীর মন্দির। মা কে প্রণাম করে, টাকাটা প্রণামীর থালায় রেখে, একদৃষ্টে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলুম অনেকক্ষণ। মনে-মনে অন্তত

হাজারবার বললুম, মা কালী, আমাকে শক্তি দাও। মা কালী, আমাকে শক্তি দাও। যিনি পুজো করেন, তিনি এক পাশে আসনে বসে ছিলেন। কী সুন্দর তাঁর চেহারা! কপালে এতখানি গোল একটা ফোঁটা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। হঠাৎ আমাকে বললেন, "তোমার কি দীক্ষা হয়েছে?"

"দীক্ষা কাকে বলে?"

"তুমি কি গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ?"

"আজ্ঞে না তো!"

"তা হলে বিড়বিড় করে কী জপ করছিলে?"

"জপ কাকে বলে?"

"একই মন্ত্র বারে-বারে বলা। একশো আটবার। হাজার আশিবার।"

"আমি বলছিলুম, মা কালী, আমাকে শক্তি দাও।"

"ওই তো জপ। মা কালী বলেছ তো, ওর আগে একটা বীজমন্ত্র লাগালেই হয়ে গেল।"

"বীজমন্ত্র কাকে বলে?"

"একটি মাত্র অক্ষর, যার ধ্বনি আছে, ঝঙ্কার আছে। সব মন্ত্র যার মধ্যে জমে আছে। তুমি যখন দীক্ষা নেবে, জানতে পারবে।"

"দীক্ষা নেব কেন?"

"তা না হলে তোমার ভেতরটা জাগবে না যে! দীক্ষা তোমাকে নিতেই হবে। তোমার লক্ষণ ভাল। দেখি, ডান হাতটা দেখি।"

ডান হাতটা তাঁর সামনে পাততেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এ কী! কেউ বেত মেরেছে না কি?"

"আজ্ঞে না, আমি একটা দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে। তাই রক্ত জমে গেছে।"

"কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেই তো পারতে।"

"আজ্ঞে না, তা হবে না। হাত দিয়ে টেনে ছিড়তে হবে।"

"বাবা, কী সাঙ্ঘাতিক। দড়িটা তো তোমার হাতে কেটে বসে গেছে গো। তোমার হাতে ব্যথা হবে। খেতে গেলে জ্বালা করবে। রাতে শোবার আগে প্রদীপের পোড়া তেল একটু লাগিয়ে নিও। যাও, হাত ধুয়ে এসো। প্রসাদ দেব।"

“আপনি আমার হাত দেখতে চাইলেন কেন ?”

“দেখতে হবে না ? এই বয়েসের ছেলে মায়ের মন্দিরে ঠায় আধঘন্টা বসে আছ। কোন্ সংস্কারে ! দেখতে হবে না !”

“সংস্কার কাকে বলে ?”

“বাঃ, তোমার তো খুব জ্ঞান-তৃষ্ণা ! তোমার হবে। তুমি কে আমি তা জানি না, তবে তোমাকে আমি বলে রাখছি, বহু লোক পরে তোমাকে আমার মায়ের ইচ্ছায় চিনবে। শোনো, সংস্কার হল মনের একটা ভাল অবস্থা, যা মানুষ নিয়ে আসে। যেমন ধরো, তুমি মায়ের কাছে এসে বলছ, মা, আমাকে শক্তি দাও। কেউ আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বলবে, একটা টনিক লিখে দিন তো, যাতে শক্তি হয়। কেউ, ধরো, বাবা-মা কে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। কেউ আবার গ্রাহ্যই করে না। কেউ, ধরো, গান শুনলে মোহিত হয়ে যায়, কেউ ভীষণ বিরক্ত হয়। সবই পূর্বজন্মের ব্যাপার। কেউ সাধুর কাছে ছোটে, কেউ শয়তানের কাছে।”

“পূর্বজন্ম কাকে বলে ?”

“সাহেবরা পূর্বজন্ম মানে না। আমরা মানি। তুমি কি ভাবছ, তুমি এই প্রথম জন্মেছ ! না, তুমি হয়তো এর আগে হাজারবার লক্ষবার জন্মেছ। তা না হলে, ভাবো, কেউ পাঁচ বছর বয়সেই সাঙ্ঘাতিক ভাল তবলা কি সেতার বাজায়। খুব ভাল ছবি আঁকে। শক্ত-শক্ত অঙ্ক কষে। কী করে করে ! এর একটাই মাত্র উত্তর, পূর্বজন্মে এসব সে করত। সেই জ্ঞানটা সে এ-জন্মে নিয়ে এসেছে।”

আমার দাদির কথা তখন মনে পড়ল। যাবার আগে গভীর রাত পর্যন্ত কেবল অঙ্ক কষতেন। খাতার পর খাতা শুধু শক্ত শক্ত অঙ্ক। জিজ্ঞেস করতুম, দাদি, এসব আপনি কার জন্যে করছেন ? বলতেন, নিজের জন্য। পরের জন্মের ভিত তৈরি করছি। আমি তো ছোট, অত সব বুঝতুম না। আজ ঠাকুরমশাইয়ের কথায় বুঝছি।

পেছন দিকে হাত ধুতে গেলুম। ছোটমতো একটা উঠোন। একটা কল্কেফুলের গাছ। একপাশে একটা উনুন। অনেক কাঠ। মাটির হাঁড়ি রয়েছে। একটা কুয়ো, পাম্প লাগানো। সব একেবারে পরিষ্কার তকতকে। জায়গাটা এত ভাল লাগল ! মনে হল এইখানেই থাকি।

ফুলের গন্ধ। ধূপের গন্ধ। একপাশে সাদা ধপধপে একটা বেড়াল ঘুমোচ্ছে। আমি আবার লেজটা পরীক্ষা করে দেখলুম, মোটা কি না! বেশ মোটা। চামরের মতো। বাবা দেখলে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠত। এখুনি বলত, চল বুড়ো, কোলে করে নিয়ে যাই। হাতে এক মগ জল ঢালতেই হুহু করে জ্বলে উঠল। বাবা রে! হাত দুটো আমাকে ভোগাবে। বিশুদা আমার এ কী করে দিলেন!

পূজারী আমার হাতে একটা সন্দেশ দিলেন। মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, "এসো, একটু জপ করে দিই।"

আমার সারা শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চোখ দুটো বুজে আসছে। মাথা থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন, "যাও, তোমার খুব ভাল হবে। খুব ভাল।"

আমি প্রণাম করলুম। আমার দাদি, আমার বাবা, আমাকে শিখিয়েছেন, তেমন-তেমন মানুষ দেখলে ভূমিষ্ঠ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করবে। জানবে, গুরুজনের আশীর্বাদের মতো জিনিস নেই। প্রণাম করে উঠতেই পূজারীঠাকুর বললেন, "যাও, আবার হাত ধুয়ে এসো। মায়ের পায়ের ফুল দেব তোমাকে। সব সময় কাছে-কাছে রাখবে।"

বাড়ি ফিরে আসতেই, মা বললে, "এইবার যে তুই বড় হচ্ছিস, তা বোঝা যাচ্ছে।"

"কেন মা?"

"অত্যাচার আরম্ভ করেছিস।"

"তার মানে?"

"মানেটা বুঝতে পারছিস না। ক'টা বাজল? তুই ক'টায় ফিরলি?"

"শোনো মা, মাই নেম ইজ বুড়ো। আমি অত্যাচার করার জন্যে জন্মাইনি। অত্যাচারীদের মারার জন্যে জন্মেছি। এই দ্যাখো আমার হাত। আমার হাত দুটোর অবস্থা তুমি দ্যাখো।"

মা চমকে উঠল, "আবার তুই মার খেয়ে ফিরে এলি! এবার তো দেখছি বেত মেরেছে!"

"আমি জানতুম, তোমার সেই রকমই মনে হবে। বলো তো, এটা কী!"

“দড়ি। দড়ি নিয়ে কী করছিস ?”

“এইটা আমি দু'ঘন্টা ধরে ছেঁড়ার চেষ্টা করছি। ছিঁড়তে পারিনি। তাই আমার হাতের এই অবস্থা।”

“আমাকে দে, বঁটি দিয়ে কেটে দিচ্ছি।”

“তাতে হবে না, মা। হাত দিয়ে টেনে আমাকে ছিঁড়তে হবে। দ্যাট ইজ মাই সাধনা। আমার হোমটাস্ক।”

মা যখন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, মুখটা এত সুন্দর দেখায় ! আমার মুখটা যদি মায়ের মতো হত। টানা-টানা দুটো ভুরু। সেই ভুরু দুটো এখন ধনুকের মতো হয়ে গেছে। চোখ দুটো মা দুর্গার মতো। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং। হাত দুটো কী লম্বা। দাদি বলতেন, যাদের হাত ছোট হয়, তাদের মনও ছোট হয়। যাদের হাত লম্বা, হাঁটু ছুঁই-ছুঁই, তাদের মন হয় সাধকের মতো। শ্রীচৈতন্যদেবের ওই রকম লম্বা হাত ছিল। আজানুলম্বিত মানে জানিস ? জানু স্পর্শ করে যে হাত।

আমার মা কে আমি কখনও নোংরা জামাকাপড় পরতে দেখিনি। সব সময় পরিষ্কার। কোনও কিছু নোংরা অপরিষ্কার দেখলে মা ভীষণ রেগে যায়। আমাকে রোজ দু'বার জামা-প্যান্ট ছাড়তে হয়। এই এখন যা পরে আছি, সব খুলে বালতিতে সাবান-জল করা আছে, তাইতে ডুবিয়ে দিতে হবে। কাল সকালে কাচা হবে।

“নাও, মাথাটা নিচু করো, মা কালী তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। একটু আগে মা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।”

আমি আমার মায়ের কথা শুনি, মা আমার কথা শোনে। মা মাথা নিচু করে বললে, “দে, আশীর্বাদ দে।”

ম্যায়ের মাথায় কী সুন্দর চুল ! কালো কুচকুচে। একটু কোঁকড়া-কোঁকড়া। সব দিক থেকে আমার মা এত ভাল ! এমন মা আর কারও নেই। দাদি কথায়-কথায় বলতেন, এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে। জবাফুলটা মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বললুম, “মা কালী, আমার এই সুন্দর মা কে একশো বছর বাঁচিয়ে রাখো মা।”

“রক্ষে কর বাপ, একশো বছর কে বাঁচবে ! তুই একটু বড় হলেই আমি চলে যাব। জানিস তো, শক্তি থাকতে-থাকতেই চলে যাওয়া ভাল।”

"আহা, তাই না কি ! তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

মা কে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। মায়ের বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকতে বেশ লাগে। কানের কাছে মায়ের হৃৎপিন্ড ধুকধুক করছে। মায়ের জীবন। আমার দাদি একটা গান শুনতে ভীষণ ভালবাসতেন, 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে।' পিংকাটা ভীষণ হিংসুটে। খাটের তলায় শুয়ে ছিল। যেই মা কে জড়িয়ে ধরেছি, অমনি ছুটে এসেছে। ভেবেছে মা কে আমি বোধহয় মারছি। সামনের দুটো পা মায়ের গায়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে। উঁউঁ করে কাঁদছে। মিষ্টি গলায় মাঝে-মাঝে ধমকাচ্ছে। আহা, মা যেন ওর একলার !

বাবার আজ ফিরতে বেশ রাত হল। সিমেন্ট জমানো বিরাট একটা ফুলগাছের টব নিয়ে হেঁইয়ো হেঁইয়ো, হেঁইয়ো করে ঢুকছে। মা বললে, "যেদিন ফিরতে রাত হবে, সেদিন বলে যাও না কেন ?"

"রাত কি হত নাকি। এইটার জন্যে হল।"

"এত ভারী জিনিস একা-একা তুলতে যাও কেন ! খ্যাঁচ করে কখন লেগে যাবে ! এটা কেনার কী দরকার ছিল ?"

বাবা এক কোণে টবটা রেখে হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললে, "তোমাদের সাঙ্ঘাতিক একটা জিনিস করে দেখাব, বনসাই। বটগাছ বনসাই করব। বুড়ো কোথায় গেলি রে ! আমার খোকা বুড়ো।"

"তোমার পেছনে বুড়ো স্ট্যান্ডিং বাবা।"

"আমার ডান হাতটা ধরে ঝুলে পড়ো ?"

"আমি যে পারব না বাবা। এই দ্যাখো আমার হাতের অবস্থা।"

"এ কী রে ! কী করে এমন নকশা করলি ?"

"সে তোমাকে আমি পরে বলব।"

পিংকা টবটাকে ফোঁস-ফোঁস করে শুঁকছে। ভেতর থেকে একটা চাপা গড়গড় শব্দ বের করছে।

বাবা বললে, "আর-একটা যা জিনিস এনেছি না ! দেখলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

মা বললে, "তা হলে আর দেখে কাজ নেই। মাথা খারাপ হয়ে গেলে মহাবিপদ হবে।"

আমি বললুম, “কী এনেছ বাবা ?”

“ফোলানো অ্যাটলাস। বুঝলি, যেই ফুঁ দিবি, ফুলে উঠবে। ফুলতে ফুলতে সুন্দর একটা অ্যাটলাস। কী মজা !”

“কোথায় বাবা ? কোথায় বাবা ?”

“ধৈযং ধরং। আমার কাঁধের এই ঝোলা ব্যাগে, সুন্দর একটা বাক্সের মধ্যে পৃথিবী এখন চুপসে আছে। দাঁড়া, আগে ড্রেসটা পালটাই, হাত-মুখ ধুই, তারপর পৃথিবী ফোলাব।”

মা বললে, “কত টাকা খরচ করলে ?”

সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। মা এমন-এমন সময় টাকার কথা তোলে, বাবার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। বাবা বললে, “বেশি না। এই টব আর অ্যাটলাস নিয়ে মোটে একশো টাকার মতো খরচ হয়েছে।”

“তোমাকে নিয়ে আমি আর পারি না বাবা। বাবাও চলে গেছেন। কার কাছে তোমার নামে কমপ্লেন করব ! আমার আর মাথায় কিছু আসছে না।”

“কমপ্লেন করার তো কিছু নেই। আমি তো সংসারের টাকা খরচ করিনি। আমি আমার জলখাবারের টাকা জমিয়ে এইসব কিনছি। আরও পাঁচটা এইরকম টব কিনব। দোকানে বেছে রেখে এসেছি। তাইতে লেবুগাছ বনসাই করব। কাঁঠাল করব। গোলঞ্চ। নিম। লেবুগাছ যা হয় না, তোমার কোনও ধারণা নেই।”

“তার মানে তুমি দুপুরে অফিসে কিছু খাও না ! এইবার শরীরটা যাবে।”

“কেন যাবে ? সকালে আমি দু' মুঠো ভাত ওই কারণে বেশি খেয়ে নিই। আর যেদিন খুব বেশি খিদে পেয়ে যায়, সেদিন করি কী, আমাদের অফিস থেকে একটু দূরে, একটা গাছতলায় ছাতুর হোটেল আছে, সেখানে গিয়ে বলি, শালপাতায় বেশ করে নুন-লঙ্কা দিয়ে ছাতু মেখে দাও, সঙ্গে এক টুকরো পেঁয়াজ। আঃ, সে যা টেস্ট ! একেবারে তোফা। পেটে থাকেও অনেকক্ষণ।”

“তোমার কোনও মান-সম্মান নেই।”

"কেন থাকবে না। মানসম্মান তো অপরের, আমাকে দেবে। ও এমন এক জামা, যা নিজে কিনে পরা যায় না। লোকে পরাবে। ছাতু খেলে মানসম্মান চলে যাবে আর কাটলেট খেলে মানসম্মান বজায় থাকবে, এ-কথা কে তোমাকে বললে ?"

"আজ কী খেলে ?"

"ঘোড়ার ডিম।"

"তোমার যা প্রাণ চায়, তা-ই করো, আমি আর কিছু বলব না। যে-যার সব বড় হয়েছ, বোধবুদ্ধি হয়েছে, কেউ তো আর ছেলেমানুষটি নও।" মা রাগ-রাগ মুখ করে চলে গেল।

বাবা বললে, "কেন যে তুমি আমাকে এত বকো ! আমি বলে কত লক্ষ্মী ছেলে ! আমার মতো ছেলে হয় !"

আমি বললুম, "আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।"

"সে তো বড় ! আমি বলেছি লক্ষ্মী। তুই আর ঝামেলা করিস না তো !"

বাবার পুজো-পাঠ হয়ে যাবার পর ঝোলা থেকে সেই অ্যাটলাস বার হল। ফুফু করতে করতে ফুলে ছোটখাটো একটা পৃথিবী হয়ে গেল। বাবার কী আনন্দ ! যত ফুলতে থাকে, ততই বলতে থাকে, "ওই দ্যাখ বুড়ো, মহাদেশগুলো কী রকম স্পষ্ট হয়ে উঠছে ! আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ। ফোলা বুড়ো, ফোলা।"

"আর ফুলবে না বাবা। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এবার তুমি ফিট করো।"

স্ট্যান্ড, নাট, স্ক্রু চারপাশে সব ছড়িয়ে আছে। বাবাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিল, কীভাবে লাগাতে হয়। সব ভুলে গেছে। একবার এটার সঙ্গে ওটা লাগাচ্ছে, একবার ওটার সঙ্গে এটা, আর থেকে-থেকে বলছে, "কী হল রে বুড়ো। এ যে উলটো হয়ে গেল রে বুড়ো !" শেষে বললে, "মাকে ডাক।"

আমার মায়ের অবশ্য খুবই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। বাড়ির ছোটখাটো সব মেরামতি কাজের জন্যে বাইরের লোক ডাকতে হয় না। ইলেকট্রিকের

কিছু হলে নিজেই করে ফেলে। আমার জামা-প্যান্ট মা-ই করে দেয়।

মা রান্নাঘরে লুচি ভাজছিল। বললে, "আমি এখন যাই কী করে!"

বাবা ও-ঘর থেকে সমানে চিৎকার করছে, "লক্ষ্মীটি একবার এসো। প্লিজ, একবার এসো।"

মা হতাশ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "কী করা যায় বল তো? তোরা বাপে-ছেলেতে দু'জনে মিলে আমাকে কি পাগল করে দিবি?"

আমারও স্বার্থ আছে। বললুম, "পাঁচ মিনিটের জন্যে গেলে তোমার এমন কী ক্ষতি হবে মা?"

"তা হলে আজ রাতে আর খাওয়াদাওয়া করে কাজ নেই! কেমন?"

মা কড়াটা ঠক করে নামিয়ে রাখল। ঝাঁজরির ওপর ফুলকো লুচি।

বাবার সামনে বসে আছে পিংকা। মাঝে-মাঝে থাবা বাড়াচ্ছে। খুব ইচ্ছে করছে আর কি! বাতাস-ভরা গ্লোবটা পেলে একটু টেস্ট করে দেখবে। বাবা বলছে, "ছিঃ, অমন করে না পিংকা। ছিঃ, অমন করে না।"

বাবার হাঁটুর পাশে পুশ, কখনও পাশ ফিরে, কখনও চিত হয়ে খলবল-খলবল করে খেলছে। সে একটা স্ক্রু পেয়েছে।

মা বললে, "তোমার দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্টই তো এসে হাজির! আমাকে আর কী দরকার!"

"আরে তুমি না হলে এসব হয়! তোমার কত বড় মেকানিক্যাল ব্রেন! তোমার তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়া উচিত ছিল!"

"থাক, খুব হয়েছে।"

মা আমাদের আসরে এসে বসায় পিংকা আর পুশের খুব আনন্দ হল। পিংকা দু'তিনবার মায়ের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। পুশ গুটিগুটি এসে মায়ের কোলে জোব্বা হয়ে বসল। বসেই গলা দিয়ে ঘুড়ুড়-ঘুড়ুড় শব্দ বের করতে লাগল। আমার মায়ের কোল পেলে পুশের আর কিচ্ছুর দরকার নেই। পিংকার আবার সেইটাতেই ঘোরতর আপত্তি। পিংকা মনে করে, মা শুধু তার একার। ফলে মাথা খারাপ হয়ে গেল। গোঁড়োর-গোঁড়োর শব্দ করছে। ভিজে ভিজে নাক দিয়ে মা কে গোঁত্তা মারছে। সামনের থাবা দিয়ে খুবলে পুশকে কোল থেকে তুলে আনার চেষ্টা করছে। ঘাড়ের কাছে কায়দা করে কামড়ে ধরে টেনে নামিয়ে আনার

চেষ্টা করছে। যখন কিছুতেই কিছু করতে পারছে না, তখন উঁউঁ করে কাঁদছে। ছোটখাটো একটা বিপ্লব বেধে গেল।

মা বললে, "কী জ্বালায় পড়েছি! এ ভাবে কিছু করা যায়!"

বাবা বললে, "যাই বলো, এই দৃশ্য দেখার জন্যে আমি হাজার বছর বাঁচতে পারি।"

আর ঠিক সেই সময় পিংকা পুশের ওপর মায়ের কোলে হালুম করে চেপে বসল। মা বললে, "তবে এই হোক। আর কিছু করে দরকার নেই।"

"দাঁড়াও, আমরা দু'জনে তোমাকে প্রোটেকশান দিচ্ছি। বুড়ো, আমি পিংকাকে ধরছি। তুই পুশকে তুলে নে।"

মা ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে গ্লোবটা ফিট করে দিয়ে বীরের মতো চলে গেল। বাবা বললে, "তোমার কোনও তুলনা নেই। তোমার তুলনা তুমি।"

মাঝখানে গ্লোব, একপাশে আমি, এক পাশে বাবা, ওপাশে পিংকা, এপাশে পুশ। আমরা গোল হয়ে বসে আছি। পিংকা আর পুশও যেন ছাত্র। অবাক হয়ে সুন্দর জিনিসটাকে দেখছে। পিংকার নাক দেখে বুঝতে পারছি, জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে। নাক দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। পুশ দেখছে পিংকাদাদা কী করে! সেই অনুসারে ঠিক হবে তার কী করা উচিত।

বাবা হাহা করে হেসে বললে, "পৃথিবী এখন আমার হাতের মুঠোয় বুড়োকুমার।"

"তুমি এবার কী করবে বাবা?"

"মাঝরাতে আমার জাহাজ ছাড়বে। আমি ক্যাপ্টেন, তুই আমার মেট। পিংকা আর পুশ আমাদের যাত্রী। আমি হয়ে যাব ভাস্কো-ডা-গামা।"

"আর মা?"

"মা হয়ে যাবে ম্যাডাম গামা। তোর নাম হবে অ্যান্টোনিও ফারনান্ডেজ। এই দ্যাখ, লিসবন থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে, ম্যাডেইরা আইল্যান্ড, ক্যানারি আইল্যান্ড হয়ে এই স্প্যানিশ সাহারায়, এই যে ভিলা সিসনেরোগ, এই বন্দরে জাহাজ ভেড়াব। তুই সকালে উঠে

দেখবি, বালি আর বালি। একদিকে অতলান্তিকের নীল জল গর্জন করছে, অন্যদিকে সাহারার শান্ত বালির ঢেউ। দেখবি, উট চলেছে মুখটি তুলে। গলায় ঘণ্টা বাঁধা। রোদ উঠলে আর তাকাতে পারবি না। চোখ ঝলসে যাবে। একটা সানগ্লাস নিতে ভুলিস না।”

“ভীষণ গরম হবে বাবা। সাহারায় না নেমে চলো না আইভরি কোস্ট-এ গিয়ে নামি। নামটা ভারী সুন্দর।”

“সাহারা নামটা খারাপ ? কবিতাতে পর্যন্ত আছে, ‘আমার বুকে সাহারার হাহাকার।’ তারপর আমরা ‘স্কেলিট্যান কোস্ট’-এ যাব। সাঙ্ঘাতিক জায়গা। কেন এইরকম নাম হয়েছে জানিস ? কোনও জাহাজ ওখানে ভিড়তে পারে না। দিন-রাত শুধু শোঁশোঁ করে বাতাস বইছে প্রচণ্ড। বেলাভূমিতে বালির সঙ্গে ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে হীরে। এই খবরটা যেই ছড়িয়ে পড়ল সভ্য দুনিয়ায়, দুঃসাহসী নাবিকের দল, যে-যেমন পারল, ভেসে পড়ল এক-একটা জাহাজ নিয়ে। উথালপাতাল ভয়ঙ্কর সমুদ্র। পাহাড়ের মতো এক-একটা ঢেউ। ভীম গর্জনে আছড়ে পড়ছে তীরে। একশো, দেড়শো, দুশো মাইল বেগে বাতাস ছুটছে। তীরের ফলার মতো বালির কণা ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে আসছে, অদৃশ্য যোদ্ধাদের ধনুক থেকে। হীরের পাহারাদার। জানিস তো, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মাঝদরিয়া ছেড়ে জাহাজ আসছে কূলের দিকে। কাপ্তেন ডেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন, ‘অন দি লারবোর্ড টু ডিগ্রি ইস্ট।’ সারেং ধীরে-ধীরে ডাঙার দিকে আসার চেষ্টা করছে।”

“লারবোর্ড মানে কী বাবা ?”

“জাহাজের বাঁ দিকটাকে বলে লারবোর্ড। ডান দিকটাকে বলে স্টারবোর্ড। জাহাজ তীরের দিকে আসছে। ভাবতে পারিস, কী অদ্ভুত জায়গা ! মরুভূমি এসেছে সাগরে স্নান করতে। আর প্রকৃতি চালিয়েছে পাখা !”

ব্যাপারটা পিংকার তেমন পছন্দ হল না মনে হয়। দু’বার ভুক্‌ভুক্‌ করে উঠল। পুশ তার পিংকাদাদার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। আর মা ওপাশ থেকে জোরে বললে, “সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খেয়ে নিয়ে, যত পারো, স্টারবোর্ড লারবোর্ড করো।”

বাবা বললে, “চলো সব, লাইন দিয়ে চলো। খাবার ঘণ্টা পড়েছে।”

পিংকা সব বোঝে। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল। ওঠার সময় পুশকে নাক দিয়ে একটা ঠেলা মারল। আমরা সব খেতে চলেছি। আগে-আগে পিংকা। তার পেছনে পুশ, আমি। সবার শেষে বাবা। লাইন চলেছে খাবার ঘরের দিকে। পিংকা জানে তার খাবার কোথায় দেওয়া আছে! রুটি আর মাংস। পুশের দিকে তাকিয়ে দু'বার গঁগঁ করল। করেই মুখ নামিয়ে খাওয়া শুরু করে দিল। পুশের বাটিতে ভাত-মাছ। মা সব রেডি করে রেখেছে। পুশটার একটু হ্যাংলা স্বভাব। নিজেরটা ছেড়ে পিংকার খাবারের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতেই হবে। পিংকা অবশ্য রোজই প্রসাদ দেয়। দু'জনের ভীষণ ভাব তো!

বাবা বললে, “পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য হল লুচি, বেগুনভাজা আর মাঝে-মাঝে এক কামড় করে কাঁচা লঙ্কা।”

আঙুল দিয়ে একটা ফুলকো লুচির মাঝখানটা ফুটো করতেই ফুস্ করে বেরিয়ে গেল গরম হাওয়া। এইটায় আমার খুব মজা লাগে! কত জনকে প্রশ্ন করেছি, হাওয়া কীভাবে বন্দী হল! কেউ সেভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেনি!

বাবা বললে, “এদিকে তিন হাজার মাইল, ওদিকে হাজার মাইল।”

“কী বাবা?”

“সাহারা মরুভূমি। অতলান্তিক থেকে লোহিত সাগর। বালির ঢেউ আর ঢেউ। সোনালি বালির ওপর দিয়ে ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাবার সময় লক্ষ-লক্ষ সাপের মতো খেলে-খেলে গেছে। যেদিকে তাকাও, শুধু বালি আর বালি। বালির পাহাড়। কবে কোন্ কালে আগ্নেয়গিরি ছিল। ভয়াবহ। হঠাৎ একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়তে শুরু করল আগুনের গোলা। নামতে লাগল লাভার স্রোত। যেখানে একদিন গ্রাম ছিল, নগর ছিল, নদী বয়ে যেত কুলকুল করে, সব চাপা পড়ে গেল লাভার তলায়। আগ্নেয়গিরির রাগ একদিন কমল সব ধ্বংস করে। লাভা জমে পাথর হয়ে গেল। বিচিত্র আকৃতির সব পাহাড় তৈরি হল। ছোট-বড় স্বচ্ছ মোতির দানার মতো উপলখণ্ডে ছেয়ে গেল অনেক জায়গা। কোথাও কোনও গাছ নেই, প্রাণ নেই, জল নেই, অভিশপ্ত ভূমির ওপর

সারাদিন কাঁপে রোদের পাখা। তামাটে আকাশ উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর। দিনে যেমন গরম, রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। ভুতুড়ে চাঁদ ওঠে। বেরিয়ে আসে হায়না, বেড়ালের মতো ছোট-ছোট শেয়াল। সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত, পাথুরে রঙের কাঁকড়াবিছে।"

আমার আর বাবার দু'জনেরই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মা লুচি দিতে এসে জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা এখন কোথায় আছ ?"

বাবা বললে, "সাহারা মরুভূমিতে।"

"দয়া করে থালায় ফিরে এসো। সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

"আমরা তো খেতে-খেতে কথা বলছি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কথাই হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে না। চারখানা লুচির সাড়ে তিনখানা পড়ে আছে।"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "কী করছিস বুড়ো, তাড়াতাড়ি হাত চালা। রাত বারোটায় আমাদের জাহাজ নোঙর তুলবে। ওই দ্যাখ, পিংকা আর পুশের খাওয়া হয়ে গেছে। শুয়ে-শুয়ে কেমন গা চাটছে।"

মা বললে, "বারোটার সময় তোমাদের নোঙর তোলাচ্ছি, তবে জেগে নয়, স্বপ্নে। ঠিক এগারোটা বাজবে আর আমি সব আলো নিভিয়ে দেব। প্রতি মাসে দুশো-তিনশো টাকা ইলেকট্রিক বিল হচ্ছে।"

খাওয়াদাওয়ার পর বাবা বললে, "চল্, আমরা ছাদে যাই। রাতে আকাশের তলায় বসলে অনেক কিছু ভেসে আসে।"

"কী আসে বাবা ?"

"কণ্ঠস্বর আসতে পারে। ভাব আসতে পারে। দৃশ্য আসতে পারে। আকাশের পশ্চিম দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকালে দেখবি, সাদা মন্দির, গাছপালা, নদী ভেসে উঠছে। হঠাৎ দেখবি একটা আগুনের গোলা উত্তর থেকে পশ্চিমে ছুটে যাচ্ছে। রাত যখন আরও গভীর হয়ে আসবে, তখন শুনবি, কোথায় যেন কোন্ মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। দ্যাখ, দ্যাখ বলছি, আমার গায়ে কীরকম কাঁটা দিয়ে উঠছে ! তোর কিছু হচ্ছে না ?"

"আমার কীরকম ভয় করছে। গা-ছমছম করছে।"

"দূর ! তুই না আমার ছেলে ! আমার বাবার নাতি, তোর কেন ভয়

করবে ? অজানাকে জানবি । বিশালের মুখোমুখি হবি । সারা পৃথিবী হবে তোর ঘর । তোকে আমি অক্সফোর্ড পাঠাব লেখাপড়া করতে । ভয় পেলে চলে !”

আমার মা ছাতটাকে কী অপূর্ব করে রেখেছে । পরিষ্কার তকতকে । চারপাশে সার-সার ফুলগাছের টব । কিছু লতানে ফুলগাছ, অপরাজিতা, জুঁই, দড়ির জাল বেয়ে-বেয়ে লতিয়ে উঠেছে । জুঁই ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে বাতাসে । বিশাল একটা টবে একটা কাঠচাঁপা গাছ ; এমনই তার বেড়ে ওঠার ভঙ্গি, যেন শতবাহু মেলে নাচছে । এরই মাঝে মাদুর বিছিয়ে আমি আর বাবা পাশাপাপি বসে পড়লুম ।

“তোর মায়ের বাগানটা বেশ মনোরম হচ্ছে রে বুড়ো !”

“দাদি যে মা কে বলে গিয়েছিলেন, ‘আমি শুরু করে গেলুম, তুমি শেষ করে যেও ।’”

“এখানে, বুঝলি বুড়ো, শুরুও নেই শেষও নেই । এ-বড় মজার জায়গা, একটা মানুষ আসে, তার তখন শুরু, সেই মানুষটা যখন চলে যায়, তার তখন শেষ । এই হল ব্যাপার, বুঝলি কি না ! অনাদি অনন্ত । সন্ধি করে অনাদ্যনন্ত । নে, চিত হয়ে শুয়ে পড় । চিতপাত ভব । আকাশটাকে দ্যাখ রে বুড়ো, ভাল করে দ্যাখ । আকাশই আমাদের আশ্রয় । মস্তকোপরি থাকে বলে ব্যস্ত মানুষ তাকাতে ভুলে যায় । সবাই মুরগির মতো মাটিতে দানা খুঁজছে । কী রকম ভাল-ভাল বাংলা বলছি বুড়ো !”

বাবা আর আমি পাশাপাশি শুয়ে পড়লুম । শুয়ে-শুয়ে আকাশের দিকে তাকালে মনটা কেমন যেন হয়ে যায় ! বাড়ি নেই, ঘর নেই, পথ নেই, মানুষ নেই । জায়গায় জায়গায় তারাদের জটলা, যেন সানাই বাজাতে বসেছে ।

“বাবা, কিছু তো শোনা যাচ্ছে না !”

“যাবে যাবে, সব যাবে । পাড়াটাকে আগে পুরোপুরি শান্ত হতে দে । শুনছিস না ! এখনও কাদের বাড়িতে গান হচ্ছে, কোথায় একটা বাচ্চা কাঁদছে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে । সব যখন শান্ত হয়ে যাবে, তখন প্রথমেই কী শুনবি বল তো ?”

“কী বাবা ?”

"জলে ঘটি ডোবালে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ শুনবি।"

"কেন বাবা ?"

"সে কি তুই বুঝবি ? তোর কি সে বয়েস হয়েছে ? মানুষ হল একটা ঘট। মহাকাল সময়ের সমুদ্রে সেই ঘট ডুবিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। মানুষ একটু একটু করে ঢালতে ঢালতে এক সময় সব শেষ করে ফেলে। তখন সেই শূন্য ঘট ঈশ্বর ভেঙে দেন। কী মজা বুড়ো ! আমি যখন ভাবি না, তখন যেন কেমন হয়ে যাই ! মনে করি একটু কম খরচ করব। আমি কে ! বৈশাখ মাসে তোর মা তুলসীগাছে ঝারি বাঁধে দেখেছিস তো ! মাটির ভাঁড়ের তলায় ছোট্ট একটা ফুটো। মা তাইতে জল ঢেলে দেয়। টুপটুপ ফোঁটা ঝরতেই থাকে, ঝরতেই থাকে। ফুটো পাত্র যদি মনে করে; জল আমি ধরে রাখব, পারবে না। সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের পাঠাবার সময় ভগবান ছ'টা ফুটো করে দিয়েছেন। ছ'টা ইন্দ্রিয়, রাগ, লোভ, মোহ, এই সব আর কি। সেই ফুটো ধরে ফিনকি দিয়ে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। তুই কি জানিস ?"

"কী বাবা ?"

"তৈলঙ্গ স্বামী নাকি অনেক অনেক বছর বেঁচেছিলেন ?"

"তিনশো বছর !"

"তা হয় তো হবে ! কী করে বল তো ! ভগবান আমাদের দেহে একটা যন্ত্র দিয়েছেন, এক জোড়া ফুসফুস। তুই যেই শ্বাস নিচ্ছিস, সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা অক্সিজেন ঢুকে পড়ছে। অক্সিজেন না পেলে প্রাণী মারা যায়, আবার এই অক্সিজেনই ভেতরটা পুড়িয়ে দেয়। জানিস তো, মানুষ যখন জ্ঞানী ছিল, তখন আয়ু মাপত বছর দিয়ে নয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে। যোগীরা তাই শিখলেন প্রাণায়াম। প্রাণায়াম হল শ্বাসপ্রশ্বাসকে খুশিমতো কমানোর কায়দা। তুই যত কম নিশ্বাস নিবি, তত বেশি দিন বাঁচবি। যোগীরা একবার শ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারেন। এই থাকার নাম কুম্ভক। আমরা তা পারি না। আমরা ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলি এলোমেলো। রেগে গেলে বেশি ফেলি। আমাদের নিজেদের ওপর কোনও কন্ট্রোল নেই। আমাদের দিন টুপটুপ করে ঝরে-ঝরে বছর হয়। বছর থেকে যুগ। একদিন সব পুঁজি শেষ।"

"বাবা, তুমি আমাকে কুম্ভক শেখাবে ?"

"আমি কি শেখাতে পারব রে ! আমার সে ক্ষমতা নেই বাবা । তবে আমি তোকে এমন এক যোগীর কাছে নিয়ে যেতে পারি, যিনি প্রাণায়াম করতে করতে হাল্‌কা হয়ে শূন্যে ভেসে ওঠেন । নদীর জলে একেবারে চিত হয়ে মড়ার মতো ভাসতে ভাসতে যত দূর ইচ্ছে তত দূর চলে যেতে পারেন ।"

"কবে নিয়ে যাবে বাবা ?"

"দাঁড়া, খোঁজ নিই, কবে তিনি কলকাতায় আসেন ! সারা বছরই তো তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান ।"

আমি জামার পকেট থেকে দড়িটা বের করে ফেলেছি । বিশুদার কাছে আমাকে কালই যেতে হবে । আজ রাতে এই দড়ি আমি ছিড়বই ছিড়ব । আমার হাত ফালাফালা হয়ে যায় তো যাক । বাবা চিত হয়ে তারাদের আসরের দিকে তাকিয়ে আছে, আর আমি আপন মনে দু'হাতে দড়ির দুটো পাশ পাকিয়ে নিয়ে প্রাণপণে টানছি । হাতে ভীষণ লাগছে । বাবা বলেছিল, ব্যথা থেকে মনটা সরিয়ে নিতে । সেই চেষ্টাই করছি । কখন আমার মা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই । চমকে উঠেছি, মা যখন বললে, "আবার সেই দড়ি !"

বাবা বললে, "তোমরা সেই তখন থেকে কী একটা দড়ি-দড়ি করছ বলো তো ! ব্যাপারটা কী !"

"তোমার গুণধর পুত্রের মুখেই শোনো । আঃ, ছাতটা কি সুন্দর !"

মা আলসের ধারে চলে গেল । আমি বাবাকে সব বললুম । বাবা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসল । বিশুদারহোমটাস্কটা বাবার মনে ধরে গেছে, "দড়িটা দে তো, আমি ছিড়তে পারি কি না দেখি ।"

"তুমি ছিড়লে হবে না বাবা । আমাকে ছিড়তে হবে । আমার পরীক্ষা ।"

"তুই বিশুর কাছেই তো প্রাণায়াম শিখতে পারিস । দুর্দান্ত ছেলে । তোর জীবনের ধারাটাই পালটে দিতে পারে । নে, টান । যত জোরে পারিস্ টান । দম নিয়ে বন্ধ করে টান । টান । আরও জোরে, আরও জোরে ।"

সারা ছাতটা এক পাক ঘুরে মা আমার সামনে এসে বসেছে। আমি টানছি। বাবা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে, "টান, টান। আরও জোরে।" এত করেও হল না। আর একবার হেরে গেলুম। হাত জ্বলছে। কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম হাতের ওপর ঝরে পড়ল। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন হয়, মনের ভেতরটা সেই রকম করছে।

বাবা বললে, "যা, সারা ছাতটা এক পাক ঘুরে আয়। ওই তুলসীগাছের টবের কাছে গিয়ে বল, নারায়ণ, আমাকে শক্তি দাও।"

সারা ছাতটা আমি একবার পাক মেরে এলুম। তুলসীগাছের টবের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে-মনে বললুম, "নারায়ণ, সত্যিই যদি তুমি তুলসীতে থাকো, আমাকে শক্তি দাও।"

মা বললে, "এদিকে আয় পাগলা।"

দেখি, দড়িটাকে মা ভাল করে দেখছে। অন্ধকার হলেও অল্প-অল্প সবই দেখা যাচ্ছে। রাতের আকাশেও একটা আলো থাকে। বিশুদার দড়িটাকে মা আগে দ্যাখেনি। মায়ের গা ঘেঁষে বসলুম। মায়ের কাছে বসতে ভীষণ ভাল লাগে। মনটাই কেমন যেন হয়ে যায়। আমার এইবার একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে মায়ের কোলে মাথা গুঁজে আজকের রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়ি।

মা বললে, "দেখি, তুই এটাকে কীভাবে ধরছিস ?"

দু'হাতে, আগে যেভাবে ধরেছিলুম, সেইভাবে ধরলুম। মা সামনে ঝুঁকে পড়ে চোখ কাছে এনে দেখল। দেখে বললে, "শোন বুড়ো, জোর খাটানোর মধ্যেও একটা অঙ্ক থাকে। শ্লোকটা মনে আছে ? বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বুদ্ধেস্তু কুতঃ বলং ! অত কাছ থেকে মাথা দুটো ধরলে যত চেষ্টাই কর, কোনওদিন ছিঁড়তে পারবি না। হাত সরা। আরও ডগার দিক থেকে ধর। লেংথ বাড়া। হ্যাঁ। নে, এইবার 'জয় মা' বলে টান। বসে হবে না। উঠে, দুটো পা ফাঁক করে দাঁড়া। বুকটা সামনে চিতিয়ে দে। হ্যাঁ, এইবার টান।"

টানার আগে জিজ্ঞেস করলুম, "মা, হবে তো ?"

"হতেই হবে। শুধু টানবি না, মনে-মনে ভাব, ছিঁড়েই গেছে। ছিঁড়েই আছে। শক্তির সঙ্গে মন লাগা।"

আমি আলসের দিকে সরে গেলুম। চোখ বুজে আমার মনের সামনে মা কে ধরলুম। পরীক্ষায় বসেও আমি তা-ই করি, তখন আর কোনও প্রশ্নই কঠিন লাগে না। পাশে মা থাকলে আমি এভারেস্টেও উঠে যেতে পারি। আমার দাদিকে স্মরণ করলুম। পেছন ফিরে তাকালুম। বাবা আর মা ছবির মতো বসে আছে। মা বললে, "টান।"

আমি টানছি। জোরে, আরও জোরে। মনে-মনে ভাবছি, এ তো ছিড়েই আছে। আমি চোখ দুটো বুজে রেখেছি। টানছি, আর মনে-মনে দেখতে পাচ্ছি, একটু একটু করে দড়ির পাক আল্গা হয়ে আসছে। ফেঁড়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ করে শেষ টান। পট করে একটা শব্দ, দুটো হাত দু'দিকে ছিটকে গেল। দু'হাতে দু'খণ্ড দড়ি। ছুটে এসে মায়ের কোলে ডাইভ। আমার চুলে মায়ের হাত খলবল করছে। কানে চুড়ির টিংটিং।

॥ ৪ ॥

বিশুদা বললেন, "তুমি তা হলে পারলে ? কীভাবে পারলে ?"

"মায়ের আশীর্বাদে।"

"বলো কী ? মা কে তা হলে চিনলে ? সারা জীবন মনে রেখো কিন্তু।"

"বাবাও ছিল। এক পাশে বাবা, এক পাশে মা, মাঝখানে আমি। বাবা বললে, পারতেই হবে। আর মা বললে, জীবনের সবকিছুতেই একটা অঙ্ক থাকে। সেই অঙ্কটাই আমাকে শিখিয়ে দিলে।"

বিশুদা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, " আরে, বলো বলো, সেই কথাটাই বলো।"

"মা বললে, যত জোরেই টান, একটা ডিসট্যান্স রাখতে হবে। খুব কাছ থেকে ধরে টানলে কিছুতেই ছিড়বে না। মা আমাকে কায়দাটা শিখিয়ে দিলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে দড়িটা ছিড়ে গেল।"

"তোমার মা কে আমার প্রণাম, শত কোটি প্রণাম। আচ্ছা নাও, কথা নয়, কাজ। দূরে একটা চৌবাচ্চা দেখতে পাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যাও, ছুটে গিয়ে মারো এক ঝাঁপ। জামা আর গেঞ্জিটা ওই হুকে

ঝুলিয়ে রেখে যাও। ছুটে গিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

বেশ মজা। আমি ছুটে গিয়ে এক লাফে চৌবাচ্চার জলে পড়লুম। পড়া মাত্রই দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে মনে হল। বরফ গলা জল। হাড় পর্যন্ত কেঁপে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে গেলুম। ততক্ষণে বিশুদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, "উঁহু, উঠলে চলবে না। সহ্য করো। অন্তত পাঁচ মিনিট তোমাকে থাকতে হবে। মনে জোর আনো।"

কোনওরকমে পাঁচ মিনিট জলে ডুবে রইলুম। কান কটকট করছে। শরীরের ভেতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চৌবাচ্চা থেকে উঠে যেই বাইরে এলুম, আঃ, কী আরাম। সারা শরীর যেন চনচন করছে। বিশুদা একটা পরিষ্কার তোয়ালে এগিয়ে দিলেন। গা মুছে ফেললুম।

"এবার জামা-গেঞ্জি পরব বিশুদা?"

"না রে ভাই, জামা-গেঞ্জির কথা আপাতত ভুলে যাও। ঢুকে পড়ো ওই ছোট ঘরটায়। তুমি ঢুকলে আমি দরজা বন্ধ করে দেব। কী, ভয় করছে?"

"একটু একটু।"

"ভয়ের কিছু নেই। যাও।"

ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন বিশুদা। ঘরের কোথাও জানলা নেই। সবটাই সাদা ধপধপে দেওয়াল। অনেক উঁচুতে দুটো ভেন্টিলেটার। এ-দেয়ালে একটা, ও-দেওয়ালে একটা। দরজাটা যেই বন্ধ হল, বুকটা কেমন যেন করে উঠল। পটপট করে গোটা বারো লাল আলো জ্বলে উঠল এদিকে ওদিকে। ঘরের উত্তাপ বেড়ে গেল। মাঝখানে একটা টুল। লাল অক্ষরে জ্বলে উঠল নির্দেশ। সোজা হয়ে বসে পড়ো টুলে। উত্তাপ বাড়ছে। ক্রমশই বাড়ছে। গলগল করে ঘামছি। সর্বাঙ্গ জ্বলছে গরমে। ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তবু আমি সহ্য করছি। বসে আছি চুপ করে। অনেক পরে সব লাল আলো একে-একে নিভে গেল। জ্বলে উঠল একটা সাদা আলো। দরজা কিন্তু খুলল না। উত্তাপ যেমন বেড়েছিল তেমনি আবার কমে এল ধীরে-ধীরে। তারপর এক সময় দরজাটা খুলে গেল। বিশুদার ডাকে বেরিয়ে এলুম। পালকের মতো হাল্‌কা লাগছে শরীর।

বিশুদা বললেন, "আর কুড়ি মিনিট তোমাকে আটকাব, তা হলেই আজকের মতো শেষ।"

আমাকে একটা থামের কাছে নিয়ে গিয়ে খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলেন। থাম পেছনে, আমি সামনে। আমার সামনে দূরে সাদা একটা দেওয়াল। দেওয়ালে একটা ছবির ফ্রেম। ফ্রেমে কোনও ছবি নেই।

বিশুদা বললেন, "পা জোড়া করে একেবারে সোজা টানটান হয়ে দাঁড়াও। এইবার সোজা তাকাও। কী দেখছ?"

"ছবির ফ্রেম। কোনও ছবি নেই।"

"আছে। তোমার মনে আছে। একটুও নড়বে-চড়বে না। সোজা ফ্রেমটার দিকে তাকিয়ে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। চেষ্টা করবে চোখের পলক যেন না পড়ে। প্রথমে চোখ জ্বালা করবে। জল এসে যাবে চোখে। আসুক। আর ওই ফ্রেমে তোমার মা কে দেখার চেষ্টা করো। মা লালপাড় সিল্কের শাড়ি পরে এলোচুলে বসে আছেন, ধ্যানে। নাও, স্টার্ট। এক, দুই, তিন, চার···।"

বিশুদা সরে গেলেন। প্রথমে আমার মনটা খুব ছটফট করল কয়েক মিনিট। হাত নাড়তে ইচ্ছে করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে ইচ্ছে করছে। চলেফিরে বেড়াতে চাইছে মন। সাদা ফ্রেমে মায়ের ছবি আসছে আর চলে-চলে যাচ্ছে। শেষে সব মন চলে গেল ছবির ফ্রেমে। রোখ চেপে গেল, কেন মা কে ধরে রাখতে পারছি না! রাখবই। রাখতেই হবে। মনের জোর যেই বাড়ালুম, অমনি দেখি কী, মা আমার পটে এসে স্থির হয়ে বসেছে। পাছে আমি নড়লে মা নড়ে যায়, তাই আমি স্থির। পাছে চোখের পাতা ফেললে মা সরে যায়, তাই আমার চোখের পলক স্থির। শেষটায় ভীষণ মজা পেয়ে গেলুম। স্থির থেকেও এ যেন এক বিরাট কাজ। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে দশটা মিনিট কেটে গেল। একভাবে, অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। এখন আর পড়ছে না। সবকিছু এখন আগের চেয়ে উজ্জ্বল দেখছি।

বিশুদা এগিয়ে এলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, "ভেরি গুড।"

জিজ্ঞেস করলুম, "এইবার?"

তোমার কেমন লাগছে বলো ?"

"ভীষণ ভাল।"

"বাঃ, ফাইন। এইবার এক পায়ে দাঁড়াতে হবে। ডান পায়ে পাঁচ মিনিট। বাঁ পায়ে পাঁচ মিনিট। পারবে ?"

"খুব পারব।"

"এইবার চোখ বুজে থাকবে, আর মনে-মনে অবিরাম মা বলে যাবে। এক-একবার মা বলবে, আর মনে করবে, চোখের সামনে আলো ঠিকরোচ্ছে। ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাশ, ফ্ল্যাশ। কেমন ? এ পায়ে পাঁচ। ও পায়ে পাঁচ। একটা পায়ে পাঁচ হলে আমি তালি দেব। নাও, স্টার্ট।"

এবার বেশ কঠিন মনে হল। এক পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়ানো ! মনে হচ্ছে টলে পড়ে যাব। কিন্তু মা-মা বলতে বলতে, ওই দিকে মন চলে গেল। এক একবার মা বলছি, আর চোখের সামনে আলো চমকে চমকে উঠছে। দারুণ মজা।

সবশেষে বিশুদা বললেন, "আজকের মতো ছুটি। এই নাও, তোমার জন্যে আমি একটা খাতা তৈরি করেছি। দ্যাখো, খাতার মলাটে লেখা আছে, সঙ্কল্প। প্রথম পাতায় লেখো, এই নাও কলম। আগে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকো। ওখানে না। পাতার শুরুতে, মাঝখানে। হ্যাঁ। ফাইন। এইবার লেখো, সত্য। সত্য বলব, সত্যকে জানব, সত্যকে ভালবাসব। আমি সত্য। হয়েছে ? এইবার লেখো, সৎ। আমার চিন্তা সৎ, আমার কর্ম সৎ, আমার সঙ্গ সৎ, আমি সৎ, চিৎ আনন্দ। লেখো, পবিত্র। আমার দেহ এক পবিত্র মন্দির। হ্যাঁ। সেই পবিত্র মন্দিরে, পবিত্র মনই আমার ভগবান। লেখো, বুদ্ধি হল বেদী। চিন্তা হল ফুল। পূজা হল কর্ম। এরপর লেখো, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত।"

বিশুদা আমার মাথায় হাত রাখলেন, "যাও, আজ থেকে তোমার হাঁটাচলায় একটা ছন্দ আনবে। তাল, লয়, ছন্দ। রিদ্‌ম। যেমন লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট, রাইট, সেই রকম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। হাঁটবে আর বলবে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। ডান বাঁ, ডান বাঁ।"

বিশুদাকে প্রণাম করলুম। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, প্রথমে এলোমেলো পা পড়ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছন্দ এসে গেল। চারটে শব্দ যেন মনে বসে

যাচ্ছে কেটে কেটে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। আর কোনও খেয়াল নেই। হাঁটছি তো হাঁটছিই। কেমন যেন নেশা ধরে গেছে। বিশুদা একটা দারুণ জিনিস দিয়েছেন আমাকে। শরীরটা যেন চনমন করছে।

মা বললে, "কী করে এলি ? তোকে খুব ঝলমলে লাগছে।"

"যা জিনিস পেয়েছি মা ! দাঁড়াও, তোমাকে একটা প্রণাম করি ভাল করে।"

"হঠাৎ ?"

"ও-কথা বোলো না মা। তোমাকে আমি রোজ দু'বেলা প্রণাম করি। এখন একটু বেশি করে করব ; কেন বলো তো ! তুমি আমার ভেতরে চলে এসেছ।"

"তোর পাগলের কথা, আমি সব বুঝি না।"

আমার মায়ের পা দুটো কী সুন্দর ! ফর্সা ধপধপে। পাতলা। যেন মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

মা বললে, "আয়, তোকে ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে তারপর রান্নাঘরে ঢুকব।"

দাদির ঘরের মেঝেতে সেই পুরু গালচেটা পাতা। যেটার ওপর বসে দাদি আমাকে পড়াতেন। সেই বসে-লেখার চকচকে চৌকি। দাদির ছবির সামনে ধূপ জ্বলছে। ছোট্ট একটা ডিশে সন্দেশ, এক গেলাস জল। জলে ভাসছে ফুলের পাপড়ি। আমাদের এই ঘরটা যা সুন্দর !

মা বললে, "নাও, হাত জোড় করে প্রার্থনা করো, জয়, জয়, দেবী, চরাচর সারে…।"

পড়াতে-পড়াতে মা এক সময় বললে, "জানিস বুড়ো, আজ দুপুর থেকে কষের একটা দাঁত ভীষণ জ্বালাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভীষণ কনকন করে উঠছে।"

"ওষুধ এনে দেব মা ?"

"দাঁতের যন্ত্রণার একটাই ওষুধ বাবা, তুলে ফেলো, সমূলে উৎপাটন। আর দু'একদিন দেখব, তারপর দেব উপড়ে। তুই এবার একা একা পড়, আমি রান্নার দিকে যাই।"

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে-গিয়ে

জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালুম। গাড়ি থেকে নামলেন এক সন্ন্যাসী। এক হাতে বড় একটা লাঠি। অন্য হাতে কমণ্ডলু। কাঁধে ঝুলছে গেরুয়া ব্যাগ। পাট করা কম্বল। ফর্সা, লম্বা চেহারা। চোখে সোনার চশমা। উঁচু খাড়া নাক। কে ইনি! দৌড়ে গিয়ে মা কে বললুম। মা দরজার দিকে এগোতে না এগোতেই, বেল বেজে উঠল।

মা প্রথমে চিনতে পারেনি। সন্ন্যাসী ফিনফিন করে হাসছেন। বড়-বড় চোখ দুটো কী সুন্দর। মিষ্টি গলা, "আমাকে চিনতে পারছেন না?"

মা না বলতে গিয়েও হঠাৎ চিনে ফেলল, "চন্দনদা! আপনি? এতদিন পরে মনে পড়ল?"

সন্ন্যাসী বললেন, "মুড়ি খাব, নারকোল খাব, শশা খাব। আর যা কখনও খাই না, তাই খাব স্টিলের গেলাসে। ভাল চা।"

গালচের ওপর সন্ন্যাসী কম্বল পাতলেন। ঝোলা ব্যাগটা রাখলেন এক পাশে। লাঠিটাকে শোয়ালেন। তার পাশে কমণ্ডলু। তারপর দাদির বইয়ের র‍্যাকের কাছে গিয়ে কী একটা বই টেনে নিয়ে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন। আমি দূর থেকে দেখছি। পড়ছেন। পড়েই যাচ্ছেন। একেবারে ডুবে গেলেন। এমনও হয়! মনে-মনে ভাবলুম, আমাকেও এই রকম হতে হবে। কোনও খেয়াল নেই। কারও সঙ্গে কোনও কথা নেই। সাহস করে কিছু বলতেও পারছি না। অমন করে একভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে, কোথাও এক জায়গায় বসে-বসেও তো বইটা পড়া যায়। অবশ্য আমিও তো আজ বিশুদার আখড়ায় অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সাধনা করে এসেছি। তবু আমি আর থাকতে পারলুম না, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর পেছনে আস্তে করে রেখে বললুম, "আপনি বসুন।"

সন্ন্যাসী চমকে উঠলেন। যে জায়গাটা পড়ছিলেন, সেই জায়গায় আঙুল দিয়ে বইটা মুড়ে আমার দিকে তাকালেন। সত্যি, কী সুন্দর চোখ! কী সুন্দর হাসি! আমাকে বললেন, "কী সুন্দর তোমার ট্রেনিং! বাঃ বাঃ! তুমি আমাকে চিনতে পারোনি! আমি তোমার দাদির বন্ধু। সাত বছর আগে, তোমার দাদিকে আমি গান শুনিয়ে গিয়েছিলুম। আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর লেখা শেষ চিঠিটি আমার ঝোলায়, আমার সঙ্গে সারা

পৃথিবী ঘোরে। তোমার দাদির মতো মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।”

সন্ন্যাসী চেয়ারে বসলেন। বইটা খুলে আবার পড়া শুরু করলেন। নিমেষে তলিয়ে গেলেন বইয়ের পাতায়। মা মুড়ি, শশা, নারকোল নিয়ে এল। সন্ন্যাসী বললেন, “আপনি গঙ্গাজল ছিটিয়ে ওই জায়গাটায় রাখুন, আমি নিবেদন করে খাব।”

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মেঝেটা মুছে দিলুম। মায়ের পুজোর আসনটা পেতে দিলুম। মা বললে, “চল্, আমরা বাইরে যাই। দরজাটা ভেজিয়ে দে। চন্দনদা, আপনার হয়ে গেলে ডাকবেন।”

বাইরে এসে ফিসফিস করে বললুম, “মা, কী সুন্দর দেখতে সন্ন্যাসী মহারাজকে, আমি অমন হতে পারব না ?”

“কেন পারবি না ? জ্ঞান, সৎ চিন্তা, সাধনা, সৎসঙ্গ। সুন্দর হবার এই তো পথ। জানিস, ওঁর মতো পণ্ডিত খুব কম আছেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত সব মিলিয়ে দশ-বারোটা ভাষা জানেন। সাঙ্ঘাতিক ভাল ছবি আঁকেন। অসাধারণ গান করেন। কী রকম জীবন জানিস ! আজ ভারতে তো কাল বিলেতে। পৃথিবীর বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান।”

“আমি ওঁকে কী বলে ডাকব ?”

“কাকু বলিস। কাকু বলতে দোষ কী ?”

এক সময়ে ঘরের দরজা খুলে গেল। কাকু, সন্ন্যাসীকাকু বেরিয়ে এলেন। হইহই করে মিশে গেলেন আমাদের সঙ্গে। বাবাও এসে গেছে। বাবার গলা পেয়ে পিংকা আর পুশও নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। বাবা দেখলুম, সন্ন্যাসীকাকুকে ‘আপনি’ বলছেন। বুঝলুম জ্ঞানী সন্ন্যাসীর বয়েস নেই, আছে সম্মান। দাদিও ‘আপনি’ বলতেন।

সন্ন্যাসীকাকু মা কে রান্নাঘর থেকে বের করে দিলেন। নিজে রাঁধবেন। বিলেতে থাকার সময় প্যারিসে রান্নায় ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছেন। একজন মানুষ কত কী শিখতে পারেন। অবাক হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি, বাবা আর সন্ন্যাসীকাকুর কাণ্ডকারখানা। মায়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে দাঁতের যন্ত্রণায়। আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে একটা ট্যাবলেট কিনে নিয়ে এলুম।

সন্ন্যাসীকাকু খিচুড়ি রেঁধেছেন। উপাদেয়। আমি খেয়ে যাচ্ছি। খেয়েই যাচ্ছি। খাওয়ার যেন কূল-কিনারা নেই। বাবা বললে, "দেখিস বুড়ো, পেটটা না ফেটে যায়?"

সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "পেট কখনও ফাটে না। পেট হল ব্লাডার। ইলাস্টিক। বলো, কেমন হয়েছে রান্না?"

"অসম্ভব ভাল। কোনও তুলনা হয় না।"

"যাবার আগে তোমাকে তিন-চারটে রান্না শিখিয়ে দিয়ে যাব। মানুষের সব কিছু শেখা উচিত। শিক্ষার শেষ নেই।"

আমরা ছাদে গিয়ে মাদুর পেতে বসলুম। সন্ন্যাসীকাকু আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম হয়ে গেছে। আমার কেবল মনে হচ্ছে সন্ন্যাসীকাকু চলে যাবার পর বাড়িটা কত খালি হয়ে যাবে! আমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তো বেশ হয়!

বাবা বললেন, "আপনি এলে মনে আগুনের ছোঁয়া লাগে। এবারে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আসছে বার দেখে নেব। প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে। সংসারটংসার নয়। জীবনটাকে আপনার মতো করে ফেলব।

সন্ন্যাসীকাকু বললে, হাসলেন। বললেন, "সব জীবনই ভাল, যদি লক্ষ্যটা ঠিক রাখা যায়। জীবন নিয়ে হাহুতাশ করবেন না। আপনার জীবনটা খারাপ কিসের? ছেলেকে মানুষ করুন। ওই তো আপনার স্বপ্ন।"

"আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে। ওকে একটু সহজ প্রাণায়াম শিখিয়ে দেবেন?"

"ওকে একটু গান শেখাতে হবে। গান হল প্রাণায়াম। হারমোনিয়ামটা মাঝে-মাঝে বাজানো হয় না পড়েই আছে?"

"অনেকদিন বাজানো হয়নি।"

সন্ন্যাসীকাকু আমাকে বললেন, "কাল ভোরে তোমাকে আমি ডেকে দেব। আমার সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে। সকালটা যদি সুর দিয়ে শুরু করতে পারো, তা হলে আর বেসুরো হবার সম্ভাবনা থাকবে না।"

মা এসে একপাশে বসল। আঁচল দিয়ে গাল চেপে রেখেছে।

“কী গো মা, ট্যাবলেটটা খেলে না ?”

“খেয়েছি।”

“তা কমছে না ?”

বাবা আর সন্ন্যাসীকাকু দু'জনেই এক সঙ্গে বললেন, “কী হয়েছে ?”

যেই শুনলেন দাঁত, কাকু বললেন, “লবঙ্গ আছে ?”

মা বললে, “আছে।”

“চলুন, নীচে চলুন, আমি এক্ষুনি সারিয়ে দিচ্ছি ”

সাত-আটটা লবঙ্গ শিলে ফেলে থেঁতো করা হল। তারপর সেই মণ্ডটা লাগিয়ে দেওয়া হল মায়ের দাঁতের গোড়ায়। বাবা আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, “কখন থেকে হচ্ছে রে ?”

“মনে হয় সেই সন্ধে থেকে।”

“আগে তো কোনওদিন হয়নি !”

বাবাকে খুবই চিন্তিত মনে হল। আমাদের কারও কিছু হলে বাবা এমন করে যেন নিজেরই হয়েছে।

কাকু বললেন, “ভাববেন না, লবঙ্গ পড়েছে। আধঘণ্টার মধ্যে কমে যাবে। তবে সারবে না। কাল একবার ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে। দাঁতের যন্ত্রণার অব্যর্থ ওষুধ হল উৎপাটন। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।”

দাঁতের যন্ত্রণা নিয়েই মা দাদির ঘরের মেঝেতে সন্ন্যাসীকাকুর জন্যে কম্বল বিছিয়ে বিছানা করছিল, কাকু এসে সরিয়ে দিলেন। বললেন, “সন্ন্যাসীর আবার বিছানা কিসের ! সন্ন্যাসীর হল আসন। সারারাত তো বসেই কাটবে। প্রয়োজন হলে আসনেই গড়িয়ে পড়ব। বউদি, যদি ঘুমোতে পারেন তো শুয়ে পড়ুন, আর তা না হলে এমন কোনও বই পড়ুন, মন ডোবানো বই, দাঁতের ব্যথা ভুলে যাবেন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমার কাছে একটা প্রোজেক্টার আছে আর আছে স্লাইড, ঘণ্টাখানেক ঘরে বসেই তীর্থ-ভ্রমণ হয়ে যাবে।”

বড় ঘরের সাদা ধপধপে দেওয়ালে কাকু প্রোজেক্টারের আলো ফেললেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোকাস ঠিক করলেন। তারপর একের-পর-এক ছবি পড়তে লাগল। হরিদ্বার, কুম্ভমেলা। মায়ের বুকে

মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে আরাম করে দেখছি। আমার চুলে মায়ের আঙুল ঘুরছে কুড়কুড় করে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছি, "যন্ত্রণা কমেছে, মা ?"

মা বলছে, "আর আমার মনে পড়ছে না রে।"

কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসীরা হর কি পৌরিতে স্নান করছেন। হৃষিকেশ। লছমনঝোলা। গীতাভবন। দেবপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ। বদ্রীনাথ। কেদারনাথ। কোথা থেকে যে কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন সন্ন্যাসীকাকু। হঠাৎ আমার কপালে, গালে, নাকে টপাটপ-টপাটপ কয়েক ফোঁটা জল পড়ল।

"মা, তুমি কাঁদছ ?"

মা ধরা-ধরা গলায় বললে, "বাবার সঙ্গে এই সব জায়গায় আমরা কত আনন্দে ঘুরেছি বুড়ো। সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছে আর বুকটা কেমন করে উঠছে।"

"দাদির সঙ্গে মা ?"

"হ্যাঁ রে।"

"আমি ? আমি তখন কোথায় মা ?"

"তুই তখনও বুড়ো হয়ে আসিসনি।"

সন্ন্যাসীকাকু দেওয়ালে একটা পাহাড় ফেলেছেন। চূড়োটা একেবারে বরফে ঢাকা। রুপোর মতো ঝকঝক করছে। এ একদম হিমালয়। আমার মা দুর্গা এখানে থাকেন।

"মা, দুর্গাপুজো কবে গো ?"

"আর কী, এসে গেল।"

"বাবাকে বলো না মা, পুজোর ছুটিতে আমরা সেই মধুপুরে আর একবার যাই। দাদির সঙ্গে আমরা মধুপুর গিয়েছিলুম না মা ?"

"হ্যাঁ রে, এই তো মারা যাবার এক বছর আগে। উঃ, সে কী আনন্দই হয়েছিল। সকাল-বিকেল আমরা মাইলের পর মাইল বেড়াতুম। বেড়ানো, গান, গল্প, খাওয়া।"

সন্ন্যাসীকাকু এবার গোমুখে চলে গেছেন। আহা, কী দৃশ্য।

মা বললে, "এই সব জায়গাতেই ভগবান থাকেন। এই তো স্বর্গ।"

বাবা কাকুকে বলছে, “চলুন মহারাজ, এই পুজোয় হিমালয়টা একবার ঘুরে আসি।”

“চলুন, আমার আর কী ? আপনাদেরই অনেক বাধা।”

“বাধা একটাই, আমাদের কুকুর আর বেড়াল। ফিরে এসে দেখব দুটোই মরে গেছে।”

বাবা ঠিক বলেছে, এটা তো ভেবে দেখিনি। পিংকা আর পুশ থাকবে কোথায় ? না, আমাদের আর কোথাও যাওয়া হবে না। কিছু দূরে ঠাণ্ডা মেঝেতে পিংকা হাত-পা ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পাখার বাতাসে লোম উড়ছে ফুরফুর করে। একেবারে কোলের কাছে ছোট্ট পুশ। হিমালয়ের দৃশ্য ভাল, আবার এ-দৃশ্যও ভাল।

আমরা যে-যার শুয়ে পড়লুম। সন্ন্যাসীকাকুর ঘরে আলো জ্বলছে। কী আশ্চর্য মানুষ ! ঘুমের ঠিক নেই। খাওয়াদাওয়ার নিয়ম নেই, অথচ চেহারা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। অনেক রাতে আর একবার উঠেছিলুম, তখনও দেখি, কাকুর ঘরে আলো জ্বলছে। খুব চাপা গলায় অপূর্ব সুরে গান গাইছেন। আমি আবার এসে টুপ করে শুয়ে পড়লুম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কাকুর গানে। কখন স্নান হয়ে গেছে। তারে ঝুলছে গেরুয়া কাপড় আর উত্তরীয়। ধূপের গন্ধ। আর এক অবাক কাণ্ড, সারা রাত বসে-বসে, দাদির বিশাল বড় একটা ছবি এঁকে ফেলেছেন। টেবিলের ওপর সোজা করে রেখেছেন, একেবারে জীবন্ত। খাটের ওপর যে ফোটোটা ছিল, সেটা অনেক ছোট। ফোটো দেখে কাকু যা এঁকেছেন, তা অনেক বড়। কী করে এমন সুন্দর ছবি আঁকেন ! কালকে আমাকে বলেছিলেন, ইচ্ছেটাই সব। ইচ্ছে করেছিল বলে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল। পরমাণু বোমা তৈরি করেছিল। পাখি হতে ইচ্ছে করেছিল, তাই বিমান। সমুদ্রে ভাসতে ইচ্ছে করেছিল, তাই জাহাজ।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, “মানুষ ইচ্ছে করলে লম্বা কি বেঁটে হতে পারে ?”

“হয়তো পারে। কথামৃত পড়ে দেখো, ঠাকুর যখন হনুমান-ভাবে সাধনা করছিলেন, সেই সময় তাঁর মেরুদণ্ড দু'তিন ইঞ্চি বড় হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছের জোর থাকা চাই গো। ঠাকুর বলতেন, ব্যাকুলতা। তাঁর উপমার তো কোনও তুলনা ছিল না। কারও চাকরি চলে গেলে, সে

কী করে ? পাগলের মতো এ-অফিস সে-অফিস ঘোরে, আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করে, ভাই কোনও পোস্ট খালি আছে ? ব্যাকুলতায় মানুষ ছটফট করে। গোঁফে চাড়া, পায়ের ওপর পা, বাবু বসে আছেন, পান চিবোচ্ছেন, কোনও ভাবনা নেই, এমন হলে হবে না। আমি চাই, তাই আমি পাই। এই হল কথা।"

মহারাজ ছবিটা গোল করে গুটিয়ে নিয়ে বললেন,চলো প্রাতঃভ্রমণ আর ছবি বাঁধাই, দুটো কাজই এক সঙ্গে সেরে আসা যাক।"

মা কে জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার দাঁত কী বলছে মা ?"

"বলছে, উৎপাটন। যা, চন্দনদার সঙ্গে বেড়িয়ে আয়। কাল সন্ধে থেকে তুই আমার দাঁত নিয়ে ভীষণ ভাবছিস। অত চিন্তার কী আছে রে পাগলা। তেমন বুঝলে তোর বাবার সঙ্গে গিয়ে তুলিয়ে আসব। পনেরো মিনিটের ব্যাপার। ধরবে আর উপড়োবে। যা, তুই বেড়িয়ে আয়।"

চন্দনমহারাজ হাঁটেন বটে ! হুহু করে হেঁটে চলেছেন। গেরুয়া চাদরের দুটো প্রান্ত পতপত করে উড়ছে। আমি কেবলই পিছিয়ে পড়ছি। একবার একবার একটু করে দৌড়ে নিচ্ছি। আবার পিছিয়ে পড়ছি। এভাবে হয় ? শেষে বলেই ফেললুম, "কাকু, আমি যে আপনার সঙ্গে পারছি না।"

কাকু দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমাদের পাশেই পার্ক। পার্কের আধভাঙা রেলিং। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। বিশাল ডালপালা মেলে আকাশের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে উঠে গেছে। কাকু বললেন, "কী পারছ না ?"

"আপনার সঙ্গে হাঁটায় পারছি না। আপনি সাঙ্ঘাতিক জোরে হাঁটেন।"

চন্দনমহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "আমি জোরে হাঁটি, না তুমি আস্তে হাঁটো ?

মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলুম। সত্যিই তো, কী উত্তর হবে ! কোনটা ঠিক ? আমার আস্তে হাঁটা, না মহারাজের জোরে হাঁটা ? কোনটা ঠিক ? কী উত্তর হবে ?

"কী ভাবছ তুমি ? জবাব দাও।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না, কী উত্তর হবে।"

"কেন, তুমি তো আমায় বললে, আমি জোরে হাঁটছি। আমি তোমাকে

বলছি, তুমি আস্তে হাঁটছ। কোনটা ঠিক ?”

“আমি জানি না মহারাজ।”

“শোনো, এখানে বিচারের বিষয় তিনটে, গতি, তুমি আর আমি। তুমি আর আমি বেরিয়ে আসি, কী রইল ?

“রইল গতি।”

“গতির সঙ্গে কী জড়িত ?”

“সময়।”

“বাঃ, ঠিক বলেছ। আর কী জড়িত ?”

“দূরত্ব।”

“একসেলেন্ট। তা হলে আবার আমরা নতুন করে সাজাই। বস্তু, দূরত্ব, আর সময়। ঠিক তো ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“তা হলে তুলনাটা আমার সঙ্গে তোমার নয়। তোমার সঙ্গে তোমার। তুমি আমার দিকে মন না দিয়ে, পথের দিকে মন দাও। মাথা নিচু করে, একাগ্র হয়ে পথ হাঁটো। পথ ছুটছে উলটো দিকে। পথকে যত জোরে ছোটাতে পারবে, তত জোরে তুমি ছুটবে সামনে। চলো, আমরা এই পার্কটায় কিছুক্ষণ বসে যাই। এখন বেশ খালি আছে।”

একটা জায়গায় একটু ঘাসমতো রয়েছে। বিশাল একটা সাবুগাছ। বাতাসে পাতার মর্মর শব্দ। গাছের তলায় মুখোমুখি আমরা দু'জনে বসলুম।

মহারাজ বললেন, “একটু আগে আমরা যা করলুম, তাকে বলে ছোটখাটো বিচার। বৌদ্ধ ধর্মে এই বিচার খুব আছে। বিচারে বুদ্ধি আর যুক্তি দুটোই খুব ধারালো হয়। তোমাদের এখানে আসার আগে মহীশূরের সেরা বৌদ্ধ বিহারে ছ'দিন কাটিয়ে এলুম। বুঝলে, সে এক অভিজ্ঞতা ! শহর থেকে বহু-বহু দূরে, জঙ্গল আর পাহাড়ি পথ পেরিয়ে সে যেন এক বিস্ময়। মনে হল, হাজার বছর পেছিয়ে গেছি। সেই বৌদ্ধ বিহারে দু'হাজার লামা প্রাচীন ধারায় জীবন কাটাচ্ছেন। সেখানে তিন বছরের শিশুও লামা হয়ে আছে। সারা দিনরাত শুধু লেখাপড়া। তা শোনো, প্রতিদিন রাতে সেখানে তর্কযুদ্ধ হয়। তোমার জানা না থাকলে মনে হবে

মারামারি হচ্ছে। তর্ক হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তাল ঠুকে, চাপড় মেরে। সেইটাই হল প্রথা। মানে ঝিমিয়ে পড়ার উপায় নেই। সন্ধেতে শুরু হয়ে তর্ক মাঝরাত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বুঝলে, আমার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল।"

"কী রকম কাকু ?"

"প্রথমত ভারতবর্ষে ওই রকম যে একটা বিহার আছে, আমার জানা ছিল না। তারপর ওই নিষ্ঠা, জ্ঞানতৃষ্ণা! একদিন দেখি, কম বয়সী লামারা তর্কের আসরে নেমেছে। শুনবে সেই তর্ক কেমন তর্ক ? আসরে নেমেছে যারা, তাদের বয়েস সাত থেকে নয়। একজন বলছে, 'বল তো ঘট বলতে কী বোঝা যায় ?'

"'যার মধ্যে সব ঘটের যা সাধারণ ধর্ম তা থাকে।'

"'আরে, আগে তো ঘট চিনবে, তবে তো সব ঘটের সাধারণ ধর্ম জানবে।'

"'আচ্ছা, যা দিয়ে জল আনা যায় তা-ই ঘট।'

"'ও, তা হলে বালতিও ঘট।'

"'না, না, গোল হতে হবে।'

"'ও তা হলে ফুটবলও ঘট।'

"'না, গোলও হবে, আবার জলও আনা যাবে।'

"'যদি ফুটো থাকে ?'

"'তা হলে সেটা ফুটো ঘট।'

"'যদি তা দিয়ে জল সব পড়ে যায় ?'

"'বেশি ফুটো থাকলে তা ঘটের অংশ, ঘট নয়।'

"এইভাবে চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শোনার জিনিস, অনুধাবনের জিনিস। আমার জীবন সার্থক। মঞ্জুশ্রী বুদ্ধের প্রতিমা দেখেছ! জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধ। অর্ধনিমীলিত টানা-টানা, ঢেউ খেলানো ধ্যানী দুটি চোখ। ডান হাতে তীক্ষ্ণ ধার অসি, যার দু'দিকই নিশিত খরশান। একদিকে কাটে অন্ধকার, অপর দিকে কুতর্কের জাল।"

সন্ন্যাসীকাকু উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন নীল আকাশের দিকে। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাবা বলছিলেন প্রাণায়াম শেখাতে, প্রাণায়াম

কাকে বলে জানো ?"

"আজ্ঞে না।"

"প্রাণের নিরোধ। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল। শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি রোধঃ প্রাণায়ামঃ। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস এমনি খুবই এলোমেলো। শ্বাস গ্রহণ আর শ্বাস ছাড়ার মধ্যে সমতা আনা হল সহজ প্রাণায়াম। এসো, এই মুক্ত বাতাসে তোমাকে সেই কায়দাটা শেখাই। বোসো। পদ্মাসনে বোসো।"

পদ্মাসন আমার জানা ছিল। দাদি আমাকে শিখিয়েছিলেন। জীবনের যা কিছু ভাল, দাদি আমাকে সময় পেলেই শেখাতেন। পদ্মাসনে বসার পর সন্ন্যাসীকাকু হাঁটুতে চাপড় মেরে তাল দিতে লাগলেন, এক, দুই, তিন, চার। চার, তিন, দুই, এক।

"সময়ের গতির দিকে নজর রাখো। যে ছন্দে যাচ্ছে, সেই ছন্দে ফিরে আসছে। মনে-মনে বলো।"

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর কাকু বললেন, "তাল আর লয়টা বসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এইবার নিশ্বাস আর প্রশ্বাস মেলাও।"

এক, দুই, তিন, চার নিলাম। চার, তিন, দুই, এক ছাড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর নেশা ধরে গেল। মনে হল একটা ঘর এলোমেলো হয়েছিল, বেশ সব গোছগাছ হয়ে এল। মিনিট-দশেক এইভাবে চলার পর সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "আর না, এবার বিশ্রাম। প্রাণায়ামের পর দুধ খেতে হয়। বাড়িতে চলো, দাদির ঘরে বসে তোমাকে আমি গায়ত্রী শেখাব।"

"আমি জানি।"

"জানার এখনও বাকি আছে। প্রতিটি শব্দকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে হয়। নীচে থেকে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠতে হবে। শেষে একেবারে মাথায়। মাথা থেকে সোজা সূর্যলোকে।"

পার্ক থেকে আমরা গঙ্গার ধারে গেলুম। সেখানে চন্দনকাকু সোজা নেমে গেলেন জলে। গামছা বা তোয়ালে নেই, কোনও পরোয়াও নেই।

সন্ন্যাসীর বস্ত্র আর উত্তরীয় ছাড়া কিছু থাকা উচিত নয়। নেইও। ভিজে কাপড়েই কাকু বাড়িমুখো হলেন। পথে রোদ আর বাতাসে সব শুকিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

বাবা বাগানে গাছের গোড়ায় খোল-পচা সার দিচ্ছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে, 'উঁ, কি গন্ধ, উঁ কি গন্ধ' করছিলুম। গাছের কী বিচিত্র খাদ্য! যার গোড়ায় অমন দুর্গন্ধ, তার আগায় সুগন্ধ ফুল। ভগবানের নিয়ম-কানুনই আলাদা। চন্দন-মহারাজ দূরে গাছের ছায়ায় বসে ছবি আঁকছেন জলরঙে। চোখে সেই অদ্ভুত গোল চশমা। ঝুলে আছে নাকের ডগায়। পিংকো গাছে-গাছে জল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যা তার স্বভাব।

বাবা জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে বুড়ো, দাঁত তুলতে কী রকম লাগে রে?"

একটু ভেবে বললুম, "খুব একটা ভাল লাগবে বলে মনে হয় না। কেন জানো, টেনে তুলবে তো!"

"তা হলে কী হবে? তোর মায়ের দাঁতটা যে তুলতে হবে। আহা, বেচারার খুব কষ্ট হবে। কিছু একটা কর না বুড়ো।"

"কী করা যায় বলো না?"

"তাই তো ভাবছি। সব ক'টা গাছকে জিজ্ঞেস করলুম। এখনও কোনও উত্তর পাইনি।"

"ব্যস্, গাছের কথা যেই বললে অমনি আমার মনে পড়ে গেল। মনে করো আমি পেয়ারা গাছ। পেয়ারা গাছের হয়ে আমি বলছি, পেয়ারা-পাতা থেঁতো করে সেই রস দাঁতের গোড়ায় লাগালে ভাল হতে পারে।"

বাবা লাফিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া। হাত মেলা, বুড়ো, হাত মেলা। ছেলেবেলায় আমার দাঁতের কী অবস্থা ছিল, তোর কোনও ধারণা নেই। সেই সময় তুই আমার পাশে থাকলে, তোর চোখ ফেটে জল আসত। আর তখন তো শরীর নিয়ে মানুষ এত মাথা ঘামাত না। তায় আবার দাঁত। দাঁতের ব্যথায় মানুষ তো আর মরে না। শেষে ময়দানব আমাকে

পেয়ারা-পাতা দিয়ে সারাল।"

"ময়দানব কে বাবা?"

"তিরিশ বছর টানা আমাদের সংসার মাথায় করে রেখেছিলেন। নাম ছিল মধুসূদন। সেই থেকে ময়দানব।"

চন্দনকাকু যে-দিকে বসে ছবি আঁকছেন, সেই দিকেই পেয়ারা গাছ। দাদি পুঁতেছিলেন। বাবা সেই গাছ থেকে এক মুঠো পেয়ারা-পাতা তুলে আনলেন। আমি জানি বাবা কী করবে। এক্ষুনি শিলে ফেলে পেয়ারা-পাতা বাটবে, তারপর সেই রস মায়ের চিকিৎসায় লাগিয়ে তবে অন্য কাজে যাবে। বাবা প্রায়ই বলে, "আমি যদি রাবণ হতুম, তা হলে দেখতিস স্বর্গের সিঁড়িটা শেষ হত। বুড়ো, তুই আমার মতো জীবনে কাজ ফেলে রাখবি না। মনে হওয়া মাত্রই করে ফেলবি।"

বিকেলে ঠিক সময়ে আমি আবার বিশুদার কাছে গেলুম। আজ সাঙ্ঘাতিক গরম পড়েছে। বিশুদা বললেন, "এই রকম একটা গরম দিনই আমি খুঁজছিলুম।"

"কেন বিশুদা?"

"শরীরকে খুব কষ্ট না দিলে মন তৈরি হয় না। জেনে রাখো, দেহ সুখে মন অসুখী। জীবন হল ছানা। জল-ছানা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। সাধুময়রার দোকানে।"

"সেই ছানাকে প্রথমে জাঁকে রাখতে হয়। ওরা বলে জাঁক দেওয়া। জাঁক কী জিনিস জানো?"

"না বিশুদা।"

"কাপড়ে জড়িয়ে সবার আগে ঝুলিয়ে রাখো। সব জল, বাড়তি জল ঝরে গেল। এরপর তালটাকে দুটো কাঠের বারকোশের মাঝখানে রেখে চাপ দাও। প্রথমে দু'হাতের চাপ; তারপর হাঁটু, শেষে পা। একটা লোক শেষে দাঁড়িয়ে উঠল। সমস্ত জল বেরিয়ে গিয়ে পড়ে রইল প্রায় শুকনো ছানার তাল। এরপর সেই ছানাকে ফেলা হল কড়ায়। নরম আঁচে তাড়ু দিয়ে নেড়ে-নেড়ে, ডলে-ডলে, পাক করে-করে তৈরি হল সন্দেশ। তারপর ছাঁচে ফেলে, তালশাঁস, বরফি, শাঁখ, বাতাবি। বুঝলে, আমাদের

জীবন হল ছানা। অনেক বাড়তি জল আছে, কষ্ট দিয়ে ঝরাতে হবে। দুঃখের নরম আঁচে পরিমাণ মতো সুখের চিনি দিয়ে, শাসনের তাড়ুতে ডলে-ডলে, মিহি থেকে আরও মিহি পাক ; তারপর কারিগরের হাতের ছাঁচ। ছানা থেকে সন্দেশ হওয়ার নামই হল মানুষ হওয়া। নাও, ওঠো।"

বিশুদার সঙ্গে এগিয়ে গেলুম। তকতকে উঠোনের মাঝখানে একটা চৌকো ইটের গাঁথনি। প্লাস্টার করা। লাল রং। বেশ বড়। অনেকটা বেদীর মতো।

বিশুদা বললেন, "এটার নাম হল কফিন। এ মুখ আর ও-মুখ দুটো মুখ খোলা। তোমাকে এ-মুখ দিয়ে ঢুকে ও-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।"

"এই ব্যাপার ! এ তো খুব সোজা।"

"চেষ্টা করে দ্যাখো। তবে সাবধান। এই দ্যাখো, ঢোকার মুখটা হল গোল। মাথা দিয়ে ঢুকবে। আর জেনে রাখো, একবার ঢুকলে উলটো দিক দিয়ে ছাড়া আর বেরনো যাবে না। আর বেরোতে হবে নিজেকে। নিজে না বেরোলে কারও সাধ্য নেই তোমাকে বের করে আনার।"

বিশুদা কী যে বলেন ! এটা কোনও ব্যাপার। কংক্রিটের একটা চারচৌকো বাক্স। এ-মুখে ঢুকে ও-মুখে বেরোব, এই তো ! বিশুদা বললেন, "নাও, জামাটামা সব খুলে ফ্যালো, শুধু জাঙ্গিয়াটা থাক। এই নাও, সারা শরীরে তেল মাখো চকচক করে। কাজটা যত সহজ ভাবছ, ততটা সহজ নাও হতে পারে। ভেতরে একটা ধাঁধা আছে। গোলকধাঁধা। স্ট্যামিনা চাই। চাই বুদ্ধি। চাই মনের জোর। আলোর নিশানা পাবে, আর মনে রাখবে, মাথা আগে, পা পিছে। কেমন ? উইশ ইউ বেস্ট অব লাক। আর-একটা কথা, ফেরার পথ নেই। সব সময় সামনে। অনওয়ার্ড, অনওয়ার্ড। ফরোয়ার্ড মার্চ। দাঁড়িয়ে পারবে না। হামাগুড়ি দিতে হবে। ইউ আর টু ক্রল। মনে করো তুমি একটা বিশাল সাপ। যাও, ঢুকে পড়ো।"

গোল গর্তটা মাটির কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা গলিয়ে, শরীরটাকে ভেতরে ঠেলে দিলুম। পায়ের পাতা দুটো তখনও ঢোকেনি। মাথাটা দেওয়ালে ঠেকে গেল। সোজাসুজি আর এগনো যাবে না। পথ ? পথ

কোথায় ? অনেকটা বাঁ দিক থেকে আলো আসছে। মাটির কাছাকাছি দেওয়ালে আর-একটা গোল ফুটো। শরীরের ওপর দিকটা বাঁকিয়ে, টুইস্ট করে মাথা ঢুকিয়ে সাপের মতো দেহটাকে টানতে লাগলুম। বেশ বুঝতে পারছি শরীরটা আমার ইংরেজি 'এস'-এর মতো হয়ে গেছে। একটাই সুবিধে, ভেতরের দেওয়াল আর মেঝে খুব মসৃণ। তেল মাখায় শরীরটা সাপের মতো সহজেই পিছলে পিছলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গর্তে মাথা ঢুকিয়ে শরীরটাকে টানতেই দ্বিতীয় খোপে কোমর পর্যন্ত ঢুকলেও তলার দিকটা বেয়াড়াভাবে আটকে গেল। ভীষণ লাগছে ; কিন্তু কিছু করার নেই। বিশুদা আচ্ছা কায়দা করেছেন। ফেরার উপায় নেই। সাঙ্ঘাতিক জ্যামিতি। ফেরার উপায় নেই। দাঁড়াবার বা বসবার উপায় নেই। বুকে হেঁটে সামনে এগোতে হবে। শরীরের বেঁকে থাকা নীচের অংশ ভেতরে আসবে তখনই, যখন উপরের অংশটাকে তৃতীয় খোপে পাঠাতে পারব। তৃতীয় অংশে যাবার গর্তটা একেবারে ডান দিকে। আলো দেখে বুঝলুম। বিশুদার গলা ভেসে এল, "চিয়ার আপ। হেরে যেয়ো না। পরাজিত হোয়ো না। এগিয়ে চলো। পারতেই হবে। তোমাকে বের করে আনার রাস্তা নেই। উপায় নেই। নিজেকেই বেরোতে হবে। এর নাম, ডেথ টানেল।"

ভেবে দেখলুম, সত্যিই তাই। অন্যভাবে বেরোবার উপায় নেই। ঢুকেছি যখন, নিজেকেই বেরোতে হবে। চাড় মেরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে মাথাটা তৃতীয় গর্তে চালিয়ে দিলুম। শরীরটাকে টানছি, ভেতরে টানছি। গরমে ঘেমে গেছি বলে, সহজেই হড়কে যেতে পারছি। বাঁ থেকে ডান, ডান থেকে বাঁয়ে যখন মোচড় মারছি, মনে হচ্ছে, হাড়গোড় সব ভেঙে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নেশা ধরে গেল। ভেতরে মোট ছ'টা গর্ত, ছ'টা খোপ। বেরিয়ে আসতে আমার আধঘণ্টা সময় লাগল। বেরিয়ে আসামাত্রই বিশুদা আমার গলায় মোটা একটা জুঁই ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। বিশুদার আখড়ার সমস্ত ছেলে সাদা পোশাক পরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হাততালি দিল। বিশুদা আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "ফ্যান্টাসটিক। এত কম সময়ে কেউ বেরোতে পারেনি 'ডেথ টানেল' থেকে। চলে যাও চৌবাচ্চায়। চান করে এসো। এরপর

একটা অনুষ্ঠান হবে তোমাকে নিয়ে।"

চান করে আসতেই, বিশুদা আমার হাতে একটা প্যাকেট দিলেন, "যাও, পরে এসো।"

প্যাকেটে একটা সুন্দর ঢোলা পোশাক। ঢোলা, থ্রি-কোয়ার্টার পাজামা, ঢোলা-হাতা বুক-চেরা কোট-জামা। কোমরে ফিতে বাঁধা। পোশাকটা পরে ব্যায়াম করার আয়নার সামনে দাঁড়াতেই, নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বিশুদা বললেন, "যাও, ওই বেদীতে বোসো।"

বেদী ঘিরে অন্য ছেলেরা বসে আছে। পিছনে ঝাঁকড়া একটা বকুল গাছ। বিশুদাও আমার মতোই একটা পোশাক পরেছেন। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! ছ'ফুট লম্বা। ফর্সা টকটকে। এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। এই উঁচু নাক। টানাটানা চোখ। ভুরু যেন তুলি-টানা কুচকুচে কালো দুটো ধনুক।

একটি ছেলে বিশুদার সামনে একটা ট্রে ধরল। কিছু ফুল, ধান, দুর্বো। হলুদ রঙের একটা তাগা। বিশুদা প্রথমে ডান হাতের ওপর বাহুতে হলুদ তাগাটা বেঁধে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। মাথায় ফুল, ধান, দুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বেদী থেকে নেমে এসে প্রণাম করলাম। বিশুদা বললেন, "আজ থেকে তুমি নির্ভীক দলের সভ্য হলে। তোমার ধর্ম হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। অত্যাচারিতের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা। সব কাজে শ্রেষ্ঠ হওয়া। সত্য বলবে। সৎ আচরণ করবে। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করবে। আলস্য ত্যাগ করবে। সৎ কর্মই হবে তোমার ধর্ম।"

"আপনাকে আমি কী দেব?"

"তুমি আমাকে দেবে নিষ্ঠা। আর দেবে এক ফোঁটা রক্ত। এই নাও।"

বিশুদা, আমার হাতে মোটা ছুঁচের মতো জিনিস দিলেন। নিয়ে গেলেন ভেতরের একটা ঘরে। ঠাকুরঘর। মেঝেতে সুন্দর কার্পেট। একটা বেদী। বেদীতে মা কালী। কার্পেটের ওপর বিশাল একটা তম্বুরা। মা কালীর বেদীর পাশে কাঠের ফ্রেমে একটা 'গং' ঝুলছে। তার তলায় বাজাবার হাতুড়ি। বিশুদা বললেন, "স্থির হয়ে চোখ বুজে বোসো। আর

মনে-মনে ভাবো, তোমার শরীর হল আলোর শরীর।”

এইভাবে আমি কোনওদিন ভাবিনি। ভাবতে ভাবতে সত্যিই মনে হল, আমি একটা আলোর শরীর পেয়ে গেছি। ভেতরটা আমার সাঙ্ঘাতিক উজ্জ্বল লাগছে। এরপর আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে এক বিন্দু রক্ত নিয়ে ফ্রেমে বাঁধানো এক টুকরো পাটের কাপড়ে টিপ লাগিয়ে দিলুম। ওই কাপড়ে আরও অন্তত পঞ্চাশটা টিপ আঁকা রয়েছে। পটটা নিয়ে বিশুদা মায়ের পায়ের তলায় খাড়া করে রাখলেন। বললেন, “এইটা হল শক্তি-পট, সঙ্কল্প পট। আজ থেকে তুমি আমাদের অর্ডারের একজন হলে।”

বাড়ি ফেরার পথে দেখি, শ্যামলরা রসে বসে আড্ডা মারছে। ওদের মধ্যে কে একজন আমাকে দেখে, সিকসিক করে তিনবার সিটি মারলে। তারপর কে একজন সুর তুললে, “কে যায়! পাগলা বাপের ন্যাংলা ছেলে যায়। কে যায়! ভণ্ডতপস্বী যায়।”

চলা থেমে আসছিল। শরীর রাগে জ্বলছে। আমার বাবাকে কেউ কিছু বললে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। বিশুদার কাছে মাত্র তিনদিন গেছি। তিনদিনে দেহ না পালটালেও মন পালটে গেছে। একটু আগে ‘মৃত্যু সুড়ঙ্গ’ আমার শরীরে শক্তির ঢেউ তুলে দিয়েছে। বিশুদার শিষ্যদের লড়াই দেখেছি। দেখেই অনেকটা যেন শেখাও হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ওই জঞ্জালগুলোর ওপর চিলের মতো তীব্র শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপর একই সঙ্গে বিদ্যুৎ-গতিতে হাত আর পা চালাই। সব ক’টার ওপর পাটির দাঁত ঝরিয়ে দিই।

বিশুদা বলেছেন, “চিলের শিকার ছোঁ মারার চিৎকার, মুরগির ডানার ঝাপটা, ঘোড়ার লাথি আর সিংহের বিক্রম এক করলে যা হয়, তাই তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে।” আর বলেছেন, “আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও কিছু করবে না।” মাথা উঁচু করে যেভাবে হাঁটছিলুম, সেই ভাবেই হাঁটতে হাঁটতে, বিন্ধ্যবাসিনীতলার মোড়ে চলে এলুম। শুকুরের দোকানে গরম জিলিপি ভাজছে। অন্য সময় হলে লোভ হত। আজ আর হল না। বিশুদা বলেছেন, “যত লোভনীয় জিনিসই হোক, যখন-তখন খাবে না। খাওয়ার একটা সময় থাকবে। আর লোভের জিনিস, ইচ্ছে হোক, তবু খাবে না। নিজেকে জয় করতে শেখো। বিশ্ববিজয় নয়, নিজেকে জয়।

সম্রাট আলেকজাণ্ডার। যখন মনে হবে নিজের শক্তিতে পারছ না, তখন চোখ বুজে ভাববে তুমি নারায়ণ ; তোমার এক হাতে সুদর্শন, অন্য হাতে শঙ্খ। ভাববে তুমি বিশাল। বৃহৎ ভাবনায় মানুষ বৃহৎ হয়। সুন্দর একটা ইংরেজি কথা বলেছেন, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। বিশুদা যেখানে আসন করে বসেন, তার পেছনের দেওয়ালে কথাটা সুন্দর করে লেখা আছে :our life is what our thoughts make it। যার যেমন চিন্তা, তার জীবনও সেই রকম হবে।

কুঁচেদের রকে তপন আপনমনে বসে আছে। ছেলেটাকে দেখলে আমার ভীষণ দুঃখ হয়। বড়-বড় চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ফর্সা, সুন্দর। একমাথা কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল। ভাল করে কথা বলতে পারে না। তো-তো করে। ট উচ্চারণ করতে পারে না। তপনের বাবা, মা, দেখা হলেই দু'চার কথার পর বলেন, 'তোমরা কত সুন্দর ! আমার একটাই ছেলে। ভগবানের কী মার দ্যাখো ! সারা জীবন কে ওকে খাওয়াবে পরাবে ! কে ওকে দেখবে ?'

তপনের পাশে গিয়ে বসলুম। কেউ তো ওর সঙ্গে মেশে না ! আমাকে দেখে একমুখ হাসি। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "কোতা দাও তুমি ?"

"বাড়ি। তুমি এখানে একা বসে কেন ?"

"আমি দেত্তি। কত ওক্।"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী বের করল। তিন-চারটে কাগজ-মোড়া লজেন্স। সামনে মেলে ধরে বললে, "তাও, তাও !"

ঠিক যেন বড় মাপের একটি শিশু। একটা লজেন্স তুলে নিতেই, মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "তব্, তব্। তব্ তোমার।"

অনেকক্ষণ জলতেষ্টা পেয়েছিল। তপনের দেওয়া একটা লজেন্স মোড়ক খুলে মুখে পুরলুম। বেশ ভাল। তপন আপনমনে হাসছে। ও ওইরকম। কখনও হাসে। কখনও দোলে। কখনও আপনমনে উঁউঁ করে গান গাইবার চেষ্টা করে। অবাক হয়ে তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বোঝার চেষ্টা করছি, ওই মন আর আমার মনে কী তফাত ! তপনের মনে এই মুহূর্তে কী হচ্ছে ! কী সে ভাবছে ! কেন সে হাসছে !

রাস্তার মোড়ের দিকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি, শ্যামল আর আরও দুটো

ছেলে আসছে। প্রথমে মনে হল, উঠে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে পড়ি। তারপর মনে পড়ল, বিশুদা বলেছেন, ভয় পাবে না। বসে রইলুম। শ্যামল আর দুটো ছেলে রকের সামনাসামনি এসে ঝপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তপনকে দেখছে। আমি শক্ত হয়ে গেছি। অনুমান করার চেষ্টা করছি, তপনকে কী করতে পারে! আগেও দেখেছি, সুযোগ পেলেই ওরা তপনের ওপর নানারকম অত্যাচার করে।

হঠাৎ তিনজনে চিতাবাঘের মতো তপনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসহায় তপন। দু'জনে চেপে ধরেছে। শ্যামল চেষ্টা করছে জামা-প্যান্ট খুলে নেবার। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। চিৎকার করে বললুম, "শ্যামল, সাবধান!"

শ্যামল আড়চোখে তাকাল। খুব অবজ্ঞার গলায় বললে, "ভাগ বেটা প্যাংলা।" তারপর ছেলে দুটোকে বললে, "সরোজ, ব্যাটাকে ধর তো চেপে। ফ্যাচোর-ফ্যাচোর করছে।"

তার মানে একটা ছেলের নাম সরোজ। তপনকে ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনটে মুখই আমি দেখছি হায়নার মতো। বাঁদিকে ঘুরে আমার দিকে আসছে। জানি কী করবে। বিশুদা সেদিন একটি ছেলেকে শেখাতে-শেখাতে বলছিলেন, 'অনেকে যখন আক্রমণ করতে আসবে, নিজেকে মনে করবে, চেপে-রাখা একটা স্প্রিং। যেই কাছাকাছি আসবে ছিটকে উঠবে। এই সময় নিজের মাথাটাকে বুদ্ধি করে কাজে লাগাবে। যে সবচেয়ে কাছে, সোজা তার চিবুকে মারবে। তলা থেকে ওপরে। তার মাথাটা পেছন দিকে হেলে যাওয়ামাত্র, গলার সামনের দিকে মারবে কাটারি মার। ব্যস, ফ্ল্যাট।'

সরোজ বলে ছেলেটা আমার খুব কাছে। "বিশুদা!" আমার বিকট চিৎকারে থতমত খেয়ে গেছে। যা প্রয়োজন, আমার ভেতরের সব বায়ু বেরিয়ে গেছে। ফুসফুস একেবারে খালি। সঙ্গে-সঙ্গে আমি স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে উঠলুম। আমার তখন দিগ্বিদিক-জ্ঞান চলে গেছে। শুধু মনে হল, আমার মাথার সামনের দিকটা ফেটে গেল। সরোজ, 'উঃ' বলে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল যাচ্ছিল। সরোজের ডানহাতের পাঁচটা আঙুল স্পোকে ঢুকে, পুরো একটা পাক

খেয়ে মটমট করে ভেঙে আটকে রইল। সাইকেল-আরোহী ছিটকে পড়ে গেল তিন হাত দূরে।

বিশুদা সেদিন একটি ছেলেকে শেখাতে-শেখাতে বলছিলেন, 'ভগবান আমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন। আত্মরক্ষার সময় দুটো চোখ একই দিকে রেখো না। দুটো চোখ দু'দিকে রাখবে। সার্চলাইটের মতো ঘোরাবে। আমিও তাই করছিলাম। একটা চোখ সরোজের দিকে, আর-একটা চোখ শ্যামলের দিকে। শ্যামলের হাতে খোলা ক্ষুর। চিতাবাঘের মতো গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। বিশুদা আমাকে মানুষের শরীরের কয়েকটা জায়গা চিনিয়ে দিয়েছিলেন, যেসব জায়গায় ঠিকমতো মারতে পারলে আর কথা নেই।

শ্যামল যেভাবে আসছে, সামনে ঝুঁকে, তাতে আমার একটাই করার আছে, হাত নয়, পা চালানো। ক্ষুর ধরা হাতের তলায় পাঞ্চ করতে হবে। কারণ, মারার সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাত দুটো আচমকা ওপর দিকে উঠবে। বুকের ওপরে কিছু করতে গেলেই মরতে হবে। মারতে হবে বুকের তলায়, পেটের মাঝখানে। মারতে হবে সাঙ্ঘাতিক জোরে। ভেবেছিলাম আমার খুব ভয় করবে। কিন্তু করছে না। মাথা ঠাণ্ডা। চোখ দুটো খোলা। ক্ষুরের ফলায় মাঝে-মাঝে আলো ঝিলিক মেরে উঠছে। আমি না মারলে ও আমায় মেরে ফেলবে। ফালাফালা করে দেবে।

টিউব থেকে যেমন তীব্র হিশ্ শব্দে হাওয়া বেরোয়, আমি সেইভাবে শব্দ করতে করতে যেভাবে ফুটবলে লাথি হাঁকড়ায়, সেইভাবে আচমকা ডান পা'টা চালাতেই, শ্যামল আঁক করে একটা শব্দ করল। তার খোলা ক্ষুর তারই বাঁগালের ওপর দিয়ে চলে গেল। শ্যামল দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ছে।

শ্যামলের পড়ে যাওয়া দেখে দলের তৃতীয় ছেলেটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। তপনকে রক থেকে তুলে, কুঁচেদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে, আমি দৌড় লাগালুম, বাড়ির দিকে নয়, বিশুদার আখড়ার দিকে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এতদিনে আমি প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

বিশুদা সবে পুজোয় বসেছেন। আমি দরজার বাইরে চুপ করে বসে

রইলুম। এতক্ষণ কোনও ভয় ছিল না। যত ভয় এইবার তেড়ে আসছে। শ্যামল যদি মরে যায়? তা হলে কী হবে! আমাকে নিশ্চয় পুলিশে ধরবে। আমার ফাঁসি হবে। মাকে, বাবাকে আর দেখতে পাব না। ভীষণ মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে বাড়ি চলে যাই। বিশুদাকে না বলে যেতে পারছি না। বিশুদা প্রায় আধ ঘণ্টা স্থির হয়ে বসে রইলেন। তারপর আসনে বসা অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আর তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বিশুদা বললেন, "কাজটা তুমি ভাল করলে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। আজই না তোমার দীক্ষা হল! সমস্ত শক্তিটা ওইখানেই ক্ষয় করলে।"

"আপনি সব জানেন?"

"কিছু-কিছু।"

আমি আর জিজ্ঞেস করলুম না, কী করে জানলেন! বললুম, "শ্যামল আমার ওপর ক্ষুর চালাতে আসছিল। তখন আমার আর কোনও উপায় ছিল না।"

"ছেলেটা কে ছিল?"

"শ্যামল, পাঁচতলা বাড়ির শ্যামল।"

"ও। ওই জানোয়ারদের বাড়ির ছেলে। চোরের বাড়ি। জাল ওষুধের কারবারি। জানো তো, ওরা এ-পাড়ায় খুব পাওয়ার-ফুল। তা, তুমি কীভাবে আত্মরক্ষা করলে?"

পুরো ঘটনাটা আমি বিশুদাকে বললুম। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "যেভাবে বসে পড়ল, মরে যাবে না তো?"

"মানুষ অত সহজে মরে না। যেখানে মেরেছ, জায়গাটা খুবই খারাপ। তবে শ্যামলরা সহজে মরে না।"

"ওর হাতে ক্ষুর ছিল বলে আমি ওপরে মারার জায়গা পাইনি। আমাকেই মেরে দিত।"

"জায়গা ছিল, অবশ্য তুমিই বা জানবে কী করে! সে-জায়গাটা হল পা। একজন ফুটবলার যেভাবে রাইট উইং থেকে লেফ্ট উইংয়ে বল মারে, সেই কায়দায় ডান পা টা টলিয়ে দিতে পারলেই ও কাটা কলাগাছের মতো পড়ে যেত। আর,একবার ফেলতে পারলে তোমার বহু কিছু করার

ছিল। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হয়ে গেছে, গেছে। একটাই ভাবনা, কেসটা কোন্ দিকে চলেছে! শোনো, শ্যামলের বাবা মোটেই সুবিধের লোক নয়। থানা-পুলিশ করতে পারে। তোমার বাড়িতে হামলা করতে পারে। তোমার বাবাকে বিপদে ফেলতে পারে। বল যখন একবার গড়িয়ে দিয়েছ, তখন খেলা যেদিকেই যাক, খেলতে হবে। গেট রেডি। প্রস্তুত হও।"

"আমি তা হলে বাড়ির দিকে যাই বিশুদা। গিয়ে দেখি কী হচ্ছে!"

"চলো, আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"বিশুদা, শ্যামল মারা যাবে না তো?"

"তোমাকে একবার বলেছি, মানুষের ভেতরের যন্ত্রপাতি অত ঠুনকো নয়। মানুষের কারখানায় তৈরি নয়। তৈরি ভগবানের কারখানায়। সে কারখানার মেকানিক আলাদা। তোমাকে একদিন অ্যানাটমিটা ভাল করে বুঝিয়ে দেব। অবাক হয়ে যাবে।"

ফেরার সময় দেখি কুঁচেদের রকের সামনে রাস্তা ফাঁকা। বোঝাই যাচ্ছে না যে, একটু আগে কিছু হয়েছিল। রাস্তার মাঝখানে চশমার দুটো ভাঙা কাচ পড়ে আছে। মনে হয়, সাইকেলে করে যে-ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, তাঁর চশমাটা ভেঙে গেছে। সরোজের আঙুলের কী হবে! শ্যামলের গালের কী হবে! এখন আমার যত সব ভাবনা আসছে।

বিশুদা গেটের কাছ থেকে চলে গেলেন। বাড়ি থমথমে। কী হল? পুলিশ এসেছিল না কি। ভেতরের ঘরে সন্ন্যাসীকাকু একা বসে আছেন। চোখে সেই গোল চশমা। সামনে খোলা বই। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এত দেরি হল?"

পাল্‌টা প্রশ্ন করলুম, "বাবা আসেনি? মা কোথায়?"

"তোমার মাকে নিয়ে বাবা গেছেন ডেন্টিস্টের কাছে। অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।"

"আমিও তা হলে যাই।"

"তুমি যাবে? জানো কি কোথায় গেছেন বা যেতে পারেন?"

"জানি।"

আমি একেবারে ভুলেই গেলুম যে, একটু আগে এত বড় একটা কাণ্ড

হয়ে গেছে। আমার মা অসুস্থ, বাবা একা। রাস্তায় নেমে হনহন হাঁটছি। ডক্টর সরকার ডেন্টিস্ট। আমার সামনে আর কিছুই নেই। প্রশান্ত সেলুনের কাছে দেখি একটা জিপ আসছে উলটো দিক থেকে। বিপদ আসার আগে জানিয়ে দেয়। কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, 'বুড়ো, পালা।' আর পালাবার সময় নেই। অনেক লোক চলাচল থাকলে ভিড়ে মিশে যাওয়া যেত। চারপাশে ফটফট করছে আলো। জিপটা আমাকে পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন বললে, "ওই যে, ওই যে পালাচ্ছে!"

হয়তো সত্যিই পালাতুম, ওই কথাটা কানে আসামাত্র পা দুটো স্তম্ভের মতো ভারী হয়ে গেল। বুকের কাছটা ছলকে উঠল। মুখটা তেতো হয়ে গেল। বুট-পরা ভারী পায়ের শব্দ। পুলিশকে ভয়, পুলিশকে ঘৃণা, সেই পুলিশ। পেছন থেকে আমার ঘাড়টা চেপে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল এত জোরে, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। কোমরে ভীষণ জোরে একটা লাথি এসে পড়ল। সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল। বলিষ্ঠ একটা হাত পেছন থেকে আমার জামার কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা মেরে মাটি থেকে টেনে তুলল। ঠোঁট কেটে আমার রক্ত ঝরছে। তবে এইবার আমি আমার সাহস ফিরে পেয়েছি। শান্ত গলায় বললুম, "সাবধান, আমার গায়ে হাত তুলবেন না।"

"কেন বাপ? তুমি কে? প্রাইম মিনিস্টার?"

গলাটা চেনা মনে হল। তাকিয়ে দেখি, শ্যামলের বাবা। সিনেমার নায়কদের মতো ঝলমলে জামা-প্যান্ট। গোল চাকার মতো মুখ। অশ্লীল দুটো চোখ।

শ্যামলের বাবার কথায় সবাই হোহো করে হাসল। একজন পুলিশ কোমরে রুলের গুঁতো মেরে জিপের পেছন দিকে তুলে দিল। আমার খুব লেগেছে। তবু আমি শান্ত। বিশুদা আমাকে বলেছেন, 'লাগে শরীরে নয়, লাগে মনে। যখন-তখন মন তুলে নাও। মনকে উড়িয়ে দাও পাখির মতো।' আমার মন উড়ে গেল। ডক্টর সরকার, ডেন্টিস্টের চেম্বারে। দেখতে পাচ্ছি, মা চেয়ারে। দাঁত তোলা হচ্ছে।

পুলিশের জিপ যেমন চলে। তীরবেগে ছুটল থানার দিকে। আমি ছোট

ছেলে, তাও আমাকে অ্যারেস্ট করল ! ভেবে অবাক । আমার তখন সাহস এসে গেছে । আমি আমার দু'পাশে বসে থাকা পুলিশ দু'জনকে বললুম, "আমি কিন্তু দাঁতের ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছিলুম । বাড়িতে না জানিয়ে রাস্তা থেকে ধরলেন কেন ?"

পুলিশ দু'জন কিছু বলার আগেই সামনের আসনে অফিসারের পাশে বসে থাকা ঝলমলে শ্যামলের বাবা বললেন, "একটু আদর করা হবে বলে মানিক । লকআপে চলো, তোমার সব ক'টা দাঁত বিনা পয়সাতেই তুলে দেওয়া হবে চাঁদু ।" শ্যামলের বাবা হ্যাহ্যা করে হাসতে লাগলেন ।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কাকাবাবু, শ্যামল কেমন আছে ?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন । ঠোঁটে সিগারেটের আগুন স্থির বিন্দুর মতো জ্বলছে । বেশ যেন অবাক হয়ে গেছেন । ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "শ্যামল কেমন আছে, সে তো তোমারই জানা উচিত । যেভাবে ক্ষুর চালিয়েছ, দশটা স্টিচ পড়েছে । চোখটা হয়তো অল্পের জন্যে বেঁচে যাবে । ছিছি, কী ফ্যামিলির কী ছেলে ! অ্যাঁ, কী দিনকাল পড়ল ! না না, আমাদের শান্ত ভদ্রপাড়ায়, এসব আমরা টলারেট করব না । বড়বাবু, এইসব ছেলেকে আপনি উচিত শিক্ষা দেবেন ।"

"ক্ষুর আমি চালাইনি কাকাবাবু । শ্যামলই এসেছিল আমার ওপর চালাতে । নিজের ক্ষুরেই নিজে আহত হয়েছে ।"

"সেটা তুমি কোর্টে প্রমাণ করো ।" বড়বাবুকে প্রশ্ন করলেন, "এদের কি জেল হবে ?"

"কিশোর অপরাধী তো ! জেল হবে, তবে আলাদা জেল । চরিত্র-সংশোধনী জেল ।"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আপনার ছেলের জেল হবে না ?"

সামনের আসনে শ্যামলের বাবার পাশে বসে থাকা বড়বাবু হাত ঘুরিয়ে আমার মাথায় আচমকা রুলের বাড়ি মারলেন । মাথাটা ঝান্ করে উঠল । মুখে বললেন, "চুপ, একেবারে চুপ ।"

এত কষ্টেও আমি মনে-মনে হাসলুম । এই শ্যামলকে আমার দাদি এক বছর পড়িয়েছিলেন । তারপর আর পড়াননি । শ্যামলের বাবাকে

বলেছিলেন, "আপনার ফ্যামিলিতে লেখাপড়া হওয়া শক্ত। জানেন তো, অর্থই হল অনর্থের মূল। নিজে ঠিক না হলে ছেলেপুলে মানুষ হয় না। নিজেকে সংযত করুন।"

সেই থেকে শ্যামলদের আমার ওপর ভীষণ রাগ, আমাদের বাড়ির ওপর রাগ। শ্যামলের বাবা আমার বাবাকে ঘুষ দিয়ে গত বছর কী একটা অন্যায় কাজ করাতে এসেছিলেন, বাবা দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে আরও রাগ। বলেছিল, পাড়া-ছাড়া করে দেবে। বাবা বলেছিল, 'দেখা যাক, কত ক্ষমতা!'

থানায় নিয়ে গিয়ে, লোহার গরাদ দেওয়া একটা খাঁচা খুলে, এক ধাক্কা মেরে ভেতরে ফেলে দিলে। প্রথমে আলো-অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, কী আছে, কে আছে। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতে দেখলুম, কোণের দিকে রোগামতো একজন মানুষ হাঁটুতে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছে। লোকটি হঠাৎ কেসে উঠল, দমকা কাসি। কাসির শব্দ শুনে বয়েস আন্দাজ করা গেল। মনে হয় বৃদ্ধ।

কাসি থামতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী কেস?"

"মারামারি।"

"শেষ করে দিয়েছ?"

"না, আধমরা।"

"তা হলে আর কী হল? যদুবংশ যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়! আমার চুরি কেস। বুঝলে, যে বাড়িতে কাজ করতুম, সাত মাস মাইনে বাকি পড়েছিল। চাইতে চাইতে শেষে বিরক্ত হয়ে কাল খুব মেজাজ নিয়েছিলুম। আজ বলে কিনা গিন্নির গলার হার পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ নিয়ে এল। হার বেরোল আমার বালিশের ভেতর থেকে। বুঝলে, কোন্ ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ভদ্দরলোক শয়তান হলে, সাঙ্ঘাতিক হয়, বুঝলে? সাপের চেয়ে বিষাক্ত। মেরেছে ছোবল, দ্যাখো এখন কী হয়! যা হবার তা হবে। আর আমি ভাবতে পারি না। আচ্ছা, তুমি কোনও খবর রাখো?"

"কী বলুন তো?"

"ভগবান-ভদ্দরলোক বেঁচে আছেন?"

"কেন থাকবেন না ?"

"যাই বলো বাপু, যত বয়েস বাড়ছে, তত সন্দেহ বাড়ছে। এই এতখানি বয়েস হল, একবারও তো তাঁর বেঁচে থাকার প্রমাণ পেলুম না।"

"ভগবানের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।"

"তার মানে তিনি নেই। যত ধাপ্পা !"

বৃদ্ধের আবার কাসি এসে গেল। আমি বসে আছি। বাবার কথা ভাবছি। মায়ের কথা ভাবছি। সন্ন্যাসীকাকু কি এখনও বই পড়ছেন ! বিশুদার সেই মৃত্যু-সুড়ঙ্গের কথা মনে পড়ছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে গলতে পারব না ! গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ালুম। বাইরে থেকে বিশাল একটা তালা ঝুলিয়ে পাহারাঅলারা পালিয়েছে। অফিস-ঘর থেকে অনেকের হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

রাত দশটার পর বাবা-মা আর সন্ন্যাসীকাকু এলেন। গরাদের ওধারে পাশাপাশি তিনজনে দাঁড়িয়েছেন। ওঁদের পেছন দিকে আলো। সেই আলোয় তিনজনকে কালো পাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। আমি কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। চোখ দুটো চকচক করছে। সন্ন্যাসীকাকুর গোল চশমার কাচ থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। মেঝের ওপর লম্বা-লম্বা গরাদের ছায়া পড়েছিল। তার গায়ে-গায়ে তিনজন মানুষের ছায়া। কোণের দিকে বৃদ্ধ মানুষটি ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেওয়াল ঘেঁষে 'দ' হয়ে পড়ে আছেন।

বাবা, মা আর সন্ন্যাসীকাকু তিনজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ বুঝলুম, অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন। আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালুম। গরাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেউ যেন শুনতে না পায়, এইভাবে বাবা আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বুড়ো, তুই কী করেছিস ! বুড়ো ?"

এইজন্যেই আমার বাবার কোনও তুলনা হয় না। অন্য কেউ হলে চিৎকার করত। বকত। এমন সব কাণ্ড করত, আবার লোক জড়ো হয়ে যেত। আমার মা-ও স্থির। সাদা শাড়ি। আমার মনে হল, আমি আর মাকে দেখতে পাব না। বুকটা কেমন যেন করে উঠল। বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। কথা আটকে যাচ্ছে।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করেছিস বুড়ো ?"

আমি সব বললুম। যা-যা হয়েছে, সবই বললুম। তিনজনে স্থির হয়ে আমার কথা শুনলেন। সন্ন্যাসীকাকু শুধু বললেন, "বড় বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়লে। এইবার আইন প্যাঁচের পর প্যাঁচ মারবে।"

মা বললে, "কী হবে ?"

মায়ের গলাটা ভারী-ভারী শোনাল। কথা কেমন যেন ফুলো-ফুলো।

"মা, তোমার দাঁত কি তোলা হয়েছে ?"

"আর দাঁত ! তুই যা কাণ্ড করলি !"

বাবা বললে, "ঠিক করেছে। সব বাড়াবাড়িরই একটা শেষ থাকে।"

মা বললে, "এখন কী হবে ?"

"এখন আমরা একজন উকিল ধরব। ধরে জামিনের ব্যবস্থা করব !"

তিনজন গরাদের সামনে থেকে সরে গেলেন অফিসের দিকে। কোণের দিকে যে প্রৌঢ় মানুষটি শুয়ে আছেন, তাঁর নাক ডাকছে। আমাকে তিনজন ছাড়াতে এসেছেন। বৃদ্ধের জন্যে কেউ আসেননি। আমি বাবাকে বলব, তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে ওই নির্দোষ বৃদ্ধকেও ছাড়াবার ব্যবস্থা করো। ওই লোকটির কেউ নেই।

অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা আবার আমার সামনে দাঁড়াল, "তোর কেমন লাগছে বুড়ো ?"

"কেমন যেন বন্দী-বন্দী লাগছে, মা।"

"ওরা বলছে, তোকে জামিন দেওয়া যাবে না। চন্দনদা কাকে যেন ফোন করছেন। ধরাধরি করে ছাড়াতে হবে। তোর লজ্জা করছে না ?"

"লজ্জা কেন করবে মা ? আমি যা করেছি, বেশ করেছি। আবার করব। যারা অন্যায় করবে, তাদের সকলকে ধরে-ধরে আমি পেটাব। আমি ছাড়া পাই, সোজা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, শ্যামলের বাবাকে ধরে হাজতে পুরুন। লোকটা চোর। লোকটা গুণ্ডা।...তুমি কেমন আছ মা ?"

"খুব খারাপ বাবা। দাঁতটা তো তুলেছে, মুখটা ক্রমশই ফুলছে।"

"কেন মা ?"

"কী করে বলব। হয়তো তা-ই হয়।"

বাইরে বেরিয়ে মাকে ভীষণ জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। এই এতক্ষণ

পরে বুঝতে পারছি, আমি বন্দী। আমার স্বাধীনতা নেই। মানুষ হয়ে মানুষই আমাকে খাঁচায় ভরেছে। বিচার হবে পরে। কোণের দিকের বৃদ্ধ মানুষটি ধড়মড় করে উঠে বসে কাসতে শুরু করলেন। কাসির ফাঁকে-ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাত ক'টা হল ভাই?"

"এগারোটা।"

"আহা, এই সময় বুটা খুব কাঁদে।"

"কে বু? সে আবার কে?"

"ওই যে গো, যে-বাড়িতে কাজ করতুম, সেই বাড়ির বাচ্চাটা। আমাকে সাঙ্ঘাতিক ভালবাসে তো! একেবারে বাচ্চা। এই সময় আমার কোলে চেপে বাড়ির সামনের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে আবার আমার কাঁধে মাথা রেখে উঁউঁ করে গান গাইতে গাইতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ত। আমি তখন বিছানায় এনে আস্তে করে শুইয়ে দিতুম।"

"আপনি কেন?"

"তুমি আমাকে আপনি-আপনি করছ কেন? আমি কি ভদ্দরলোক? আমি একটা চোর।"

"গুরুজনদের আমি আপনিই বলি।"

"তুমি খুব সভ্য ছেলে। দিনকাল কীরকম পালটে গেছে, তাই না? চোররা সব বাইরে। সাধুরা সব ভেতরে।"

বৃদ্ধ হাহা করে হাসতে লাগলেন। হাসি থেকে শেষে বেদম কাসি। কাসি একটু কমতে বললেন, "বুঝলে, এবার আমি মরেই যাব। আর মরলেই বা কী! আমার তো কেউ কোথাও নেই রে বাপু। তোমার মতো আমার যদি একটা ছেলে থাকত!"

বাবা আর সন্ন্যাসীকাকু গরাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি এগিয়ে গেলুম।

"শোন বুড়ো, তুই আর-একটু কষ্ট কর। জামিন দেবে বলেছে। আমার বন্ধু যোগেনকে ধরে আনি। চিয়ার আপ বুড়ো।"

"আমি কোনও অন্যায় করিনি বাবা। আমি এখানে বেশ ভালই আছি। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

"বল।"

“তুমি ওই ভদ্রলোকের জামিনের ব্যবস্থা করতে পারবে ?”

“অ্যাঁ। কে উনি ?”

“মিথ্যে চুরির দায়ে ধরে এনেছে। কেউ নেই। ভদ্রলোকের কেউ নেই।”

“সেটা কি ঠিক হবে ?”

অন্ধকার কোণ থেকে ভদ্রলোক বললেন, “না ঠিক হবে না। আমি অজ্ঞাতকুলশীল।”

বাবা বললে, “কিছু মনে করবেন না। নিচু মনের পরিচয় দিয়ে ফেলেছি। আমার ছেলে যখন বলেছে, তখন অবশ্যই আমি ব্যবস্থা করব।”

বৃদ্ধ বললেন, “আমার কিন্তু কিছুই নেই। চালচুলো ঘটিবাটি।”

“সেইজন্যেই তো করব।”

“পরিচয় না জেনে ? জানেন, আমি চোর ?”

“কথা আর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, আপনি জ্ঞানী।”

বৃদ্ধ হাহা করে হেসে উঠলেন। কোনওরকমে কাসি চেপে বললেন, “পৃথিবীতে কিছু বোকা লোক আছে বলে এখনও মানুষ বেঁচে আছে।”

বাবা, মা আর সন্ন্যাসীকাকু চলে যাচ্ছেন।

আমি বললুম, “মা, তুমি আর ওই শরীরে আসবে না কিন্তু।”

ওঁরা চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন, “এখনও এমন পরিবার এ-পাড়ায় আছে ? তোমাদের পরিচয় ?”

“একটু পরেই জানতে পারবেন।”

রাত দেড়টার সময়ে আমরা দু'জনে জামিনে ছাড়া পেলুম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম, সিদ্ধেশ্বর দাস।

বাবা জিজ্ঞেস করলে, “আপনি এখন কোথায় যাবেন ?”

“বাবু, আপনি আমাকে 'তুমি' কি 'তুই' বলুন। ভুল করছেন, আমি ছোটলোক, আমি চাকর।”

“সে আমি বুঝব। এখন বলুন, আপনি যাবেন কোথায় ?”

“রাতটা শ্মশানে কাটাই। সবচেয়ে ভাল জায়গা।”

"না, রাতটা আপনি আমার বাড়িতে কাটাবেন।"

সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "সত্যিই আমার একটা শিক্ষা হল। আপনারা কী ধাতুতে তৈরি! আপনাদের সংসার যেন শিবের সংসার। কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, আজ জন্মাল বুড়োর মন। হরি ওম্। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিদ্ধেশ্বর দাস হয়ে গেলেন আমার সিধুজেঠু। অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পাইনি, আলোয় দেখলুম, যীশুখ্রীস্টের মতো মুখ। বাড়িতে ঢুকেই বাগানের অন্ধকারে কুয়োতলায় চলে গেলেন। অত যাঁর কাসি, তিনি রাত পৌনে দুটোর সময় হুড়হুড় করে চান করলেন। সংস্কৃত স্তোত্রপাঠের শব্দে বাগান ভরে গেল।

সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "কী অপূর্ব উচ্চারণ! মানুষটির অতীত জানতে ইচ্ছে করছে। নিজের পরিচয় মনে হয় গোপন করছেন।"

বাবা এসে বললে, "অবস্থা খুব খারাপ। তোমার মায়ের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। সারা মুখ ফুলে চোখ-টোখ সব চাপা পড়ে গেছে।"

রাত তখন তিনটে। আমাদের কারও চোখে ঘুম নেই। মায়ের ঘরে পিংকা আর পুশ, দু'জনেই জেগে। পিংকা মাঝে-মাঝে খাটের ধারে সামনের দুটো পায়ে ভর রেখে উঠে-উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাকে দেখছে। ছটফট করছে। আমরাও ছটফট করছি।

সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "কীভাবে দাঁতটা তুললেন! এমন সাঙ্ঘাতিক ইনফেকশন হয়ে গেল!"

সিধুজেঠু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঠায় বসে আছেন। ঠোঁট নড়ছে। আঙুলে আঙুল সরছে। বেশ বুঝতে পারছি, জপ করছেন। আমি দাদির ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, "দাদি, আজ সন্ধে থেকে এ আপনি কী করছেন? কেন করছেন?"

অন্যদিন দাদির মুখে একটা হাসি লেগে থাকে, আজ যেন গম্ভীর! মুখটা কালো।

"দাদি, মায়ের কিছু হবে না তো!"

কোনও উত্তর নেই। তাকিয়ে রইলুম দাদির মুখের দিকে। ভোর হয়ে আসছে। আলাদা একটা আলো এসে পড়েছে দাদির মুখে। থমথমে মুখ।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। শ্যামলকে মেরেছি বলে রাগ হল কি ? আমি কি অন্যায় করেছি ! দাদি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখো বুড়ো, পরিবারের মুখ ডুবিয়ো না। মুখ উজ্জ্বল কোরো। উজ্জ্বল, আরও উজ্জ্বল।'

একেবারে শেষ রাতে বাবা চা করতে চাইলে।

সিদ্ধেশ্বরজেঠু বললেন, "ও কাজটা আমার। আপনি বসুন।"

সেই সংসারের কাজে লেগে গেলেন সিধুজেঠু। কে জানে, মানুষের জীবনে কী থাকে ! আজ যারা হাসে, কাল তারা কাঁদে। আজ যাদের দুঃসময়, কাল তাদের সুসময়। আজ যাদের সুসময়, কাল তাদের উলটো। আমার দাদি তাঁর 'অপদার্থ বিজ্ঞান'-এ লিখে গেছেন, 'সময়কে ধরে রাখা যায় না। যা হবার তা হয়, যা হবার নয় তা হয় না। আমরা সব নাচের পুতুল।'

॥ ৬ ॥

আমাদের এত আনন্দের বাড়িটা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। সেই দাদির কথা মনে পড়ছে। বলতেন, সময় কখনও এক রকম যায় না। অন্য-অন্য দিন, বাবা এই সময় বাগানে গিয়ে গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। ফুলেদের বলে ফুটতে। দোয়েলপাখিদের শিস শুনে বলে, 'বা ভাই, বেশ হচ্ছে, বেশ। আর-একটু খেলিয়ে।' বাগানের এপাশ থেকে ওপাশ আমরা নালি কেটে সাদা কালো পাথর বিছিয়ে পাহাড়ি নদী করেছি, সেই নদীতে তিন-চার বালতি কলের জল ঢেলে বলতে থাকি, 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে-বাঁকে।' আজ আর কিছুই নেই।

সিধুজেঠু বললেন, "সকাল হয়েছে। আমি ডাক্তার ডেকে আনি। আর ফেলে রাখা যায় না। মায়ের আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

আমি যতবার মা বলে ডাকছি, চোখ মেলে মা চাইছে ; কিন্তু কথা বলতে পারছে না। আমার চুলে হাত বোলাচ্ছে আর দু' চোখ বেয়ে জল নামছে। ঠাকুর, তুমি আমার মাকে কী করে দিলে ঠাকুর। সন্ন্যাসীকাকু

বলছেন, "আমি অসহায়। প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।"

ডাক্তারবাবু এলেন। আমাদের খুব ভালবাসেন। ডক্টর যজ্ঞেশ্বর রায়। প্রবীণ মানুষ ; কিন্তু খুব তাঁর নাম। মাকে দেখেই বললেন, "সবার আগে রক্ত পরীক্ষা। আমি আমার কম্পাউণ্ডারকে পাঠাচ্ছি।"

দশটার সময় আমাকে আর সিধুজেঠাকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। কোনও উপায় নেই। সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "আমি বউদিকে সামলাব, আপনারা ঘুরে আসুন। এদিকে যতই বিপদ হোক, আইন তো আর ছাড়বে না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে একশো ছত্রিশ ঘা। বউদিকে আমি পাতলা করে সুজির পায়েস করে দেব।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুড়ো, ভেঙে পোড়ো না। সময় খারাপ, তবু পেরিয়ে যেতে হবে। সময় কখনও এভারেস্ট, কখনও ফুলের উপত্যকা।"

আমি ভাবছি, আমার মায়ের এই অবস্থা, যদি আজ আমাকে জেলে ভরে দেয় ? তা হলে কী হবে ? বাবা বলছিল, আমাদের আর খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন নেই। সিধুজেঠু বললেন, "তা কখনও হয়, দেহ-ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে চলে ?

মা ওই অবস্থাতেও বললে, "আমি তোমাদের দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিই।"

সিধুজেঠু বললেন, "ভগবান আমাকে তা হলে পাঠালেন কী করতে ?"

ঠিক দশটার সময় আমরা কোর্টে হাজিরা দিলাম। উকিল যোগেনবাবুর ফর্সা চেহারা কালো কোটে আরও ফর্সা দেখাচ্ছে। আমাদের সাহস দিচ্ছেন, "ভয়ের কিছু নেই। পেটি কেস। এ-সব আজকাল অনবরত হচ্ছে। ঝামেলা, সময় আর টাকার শ্রাদ্ধ। এগারোটার সময় জজসাহেব এজলাসে এসে বসলেন। পৃথিবীতে এমন ঘিচিরমিচির জায়গা আর দুটো নেই। কত রকমের লোক। কত রকমের কথা। কেউ মুখভার করে বসে আছে। কেউ উকিলের পেছনে ছুটছে। বাইরে একটা বাঁধানো গাছতলায় গুচ্ছের লোক বসে। পুলিশের বিশ্রী কালো গাড়ি থেকে আগামী নামাচ্ছে। হাতে হ্যাণ্ডকাফ, কোমরে মোটা দড়ি।

শ্যামলের বাবা এসেছেন। সেই রকম বিশ্রী ঝলমলে জামা পরে।

আগে দেখতে বেশ ভালই ছিলেন। এখন থলথলে বিকট একটা ভুঁড়ি হয়েছে। বারোটার সময় আমার ডাক পড়ল। উকিলে আর জজসাহেবে আইনের ভাষায় গাদা-গাদা কথা হল। আবার জামিন। আবার সাতদিন পরে আসতে হবে। সেইদিন আবার কেস উঠবে। শুরু হবে বিচার। আমি নাকি শ্যামলকে ক্ষুর চালিয়েছি। আমি এক বিপজ্জনক, বিশ্রী ছেলে। আমি যে-পাড়ায় থাকব, সে-পাড়ার কোনও সৎ ছেলেই নিরাপদ নয়। কথা শুনছি, আর মনে-মনে হাসছি। অপদার্থ বিজ্ঞানে, আমার দাদি বড়-বড় করে লিখে গেছেন, 'এ হল সেই যুগ, যে যুগে সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করা যাবে না।'

একটাই ভাল হল, সিধুজেঠু ছাড়া পেয়ে গেলেন। ওরা কেস তুলে নিয়েছে। কারণটা শোনা গেল। সেই বাচ্চাটা কেবল কাঁদছে। খাচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে না। কাল সারারাত কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। আদালতের বাইরে এসে, বাবা সিধুজেঠুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আবার ওখানেই ফিরে যাবেন ?"

"আমার পয়সা থাকলে এদের বিরুদ্ধে এখনই মানহানির মামলা ঠোকা যায়। গরিবের আবার মান-সম্মান কী বলুন !"

"আপনি কে বলুন তো ?"

"আই অ্যাম এ ম্যান।"

সিধুজেঠুর মুখে ইংরেজি শুনে আমরা অবাক।

বাবা বললে, "তা হলে কী সিদ্ধান্ত ?"

"আপনার বিপদে আপনার পাশে দাঁড়ানো।"

"আর বাচ্চাটা ?"

"মাঝে-মাঝে গিয়ে সামলে দিয়ে আসব।"

সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে শাঁখ বাজল না। ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিলুম আমি। দাদির ছবির মাথায় একটা ফুল দেবার চেষ্টা করছি। যতবার দিই, ততবারই পড়ে যায়। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কেন দাদি আমার দেওয়া ফুল নিচ্ছেন না ! সন্ন্যাসীকাকু বললেন, "মনে কুসংস্কার আনছ কেন ? ফ্রেমের মাথায় ফুল ধরিয়ে রাখা খুব শক্ত। মনকে মুক্ত করো। মুক্ত।"

রাত সাতটার সময় আমি আর বাবা দু'জনে মিলে ডাক্তারখানায় গেলুম। রক্তের রিপোর্ট পাওয়া যাবে। বাবা পথে যেতে-যেতে আমাকে কেবল বলতে লাগল, "বুঝলি বুড়ো, ওই হ্যাঁচকা টান মেরে তুলেছে তো, তাই মনে হয় মুখটা ফুলে গেছে। ও কিছু না। দু' পুরিয়া ওষুধ পড়লেই দেখবি মুখটা চুপসে আবার আগের মতো হয়ে গেছে। আরে দাঁত বুঝলি তো, দাঁত খুব সহজ জিনিস নয় বুড়ো। কাঁচা দাঁত ধরে টানাহ্যাঁচড়া করলে একটু হবে। একটু ভুগতেই হবে।"

"আমিও তো তাই ভাবছি বাবা। এ-দাঁত তো হাতির দাঁত নয় যে, তুমি টেনে বের করে আনলে, আবার ইচ্ছে মতো খাপে ভরে দিলে। মানুষের দাঁত।"

বাবা আর আমি এই সব কথা বলেছি বটে, কিন্তু চিন্তা তাতে কিছুই কমেনি। এইরকম তো হয় না। কেন হল ! চেম্বারে প্রচুর রুগী, তবু আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবু মুখ তুলে তাকালেন, "ও হ্যাঁ, আপনার রিপোর্ট।" অনেক খাম পড়ে আছে টেবিলে। একটা খাম তুলে নিলেন। ভেতর থেকে কাগজটা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলেন, তারপর আপনমনেই বলে উঠলেন, "এ কী ? এ কী সর্বনেশে ব্যাপার !" আমি আর বাবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলুম টেবিলের সামনে। বাবা একটা হাত আমার কাঁধে রাখলে। ডাক্তারবাবু রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। মুখ কালো, অন্ধকার।

বাবা জিজ্ঞেস করল, "কী হল ডাক্তারবাবু ?"

"কোনও আশা নেই। দিনের ব্যাপার। তিনদিন, সাতদিন, পনেরোদিন।"

"অসুখটা কী ?"

"ব্লাড ক্যানসার।"

আমার কাঁধে বাবার হাতটা কেঁপে উঠল, "ব্লাড ক্যানসার ? কোনও আশা নেই ?"

"এ দেশে নেই।"

"কী হবে তা হলে ?"

"সহ্য করতে হবে। ভাগ্যকে মেনে নিতে হবে।"

"কেউ কিছুই করতে পারবেন না ? কোনও ভাবেই নয় ?"

"অনেক রকম চেষ্টা হবে। তবে হবে না কিছুই।"

"বাড়ি ফেরার পথে আমরা সেই পার্কটায় পাশাপাশি বসলুম। বাবা হুহু করে কেঁদে ফেললে। আমিও আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলুম না। একটা আধমরা গাছতলায় বসে আমরা দু'জনে খুব কাঁদলুম। বাবা ধরা-ধরা গলায় বললে, "যাঃ, সব গেল।"

"বাবা, আমরা যদি অনেক অনেক রক্ত দিই, তা হলে মা বাঁচবে না ?"

"ওই তো শুনলি ডাক্তারবাবু কী বললেন ?"

"শোনো বাবা, তারকেশ্বরে যাবে ? গিয়ে হত্যে দেবে। শুনেছি ওষুধ পাওয়া যায়।"

"যেতে পারি। তবে এ-হল রাজ-রোগ। জানিস বুড়ো, ভালই হল, আমি চন্দনদার সঙ্গে চলে যাব। আর আমি বাঁচতে চাই না।"

"বা রে, আমি তা হলে কোথায় যাব ?"

"তোর দুঃখ হচ্ছে না বুড়ো ? তোর কাঁদতে ইচ্ছে করছে না ?"

"আমার বুকের কাছটায় পাক মারছে। তোমাকে আমি বলতে পারব না আমার কী হচ্ছে !"

"চল, গোটা পার্কটায় গোল হয়ে দৌড়োই। দৌড়,দৌড়ে, দৌড়ে, দৌড়ে ভেতরটা একেবারে খালি করে ফেলি। আয়, আমরা আমাদের খুব কষ্ট দিই। কী হবে সুখে। কী হবে ভোগে। আমি তো সংসারের কিছুই বুঝি না। আমি তো একটা হাবা। আমি তো একটা গবা। আমি তো একটা অপদার্থ। আমাকে তো চালায় তোর মা। এই পার্কে বসে, এই গাছ সাক্ষী রেখে, তুই ছেলে, তোকে আজ আমি একটা কথা অকপটে বলি। তোর মা আমাকে মানুষ করেছে। আমাকে পড়িয়েছে। আমাকে এম· এ· পাশ করিয়েছে। আমি টাকাপয়সা, তেল-ডাল-চাল-নুন কিছুই বুঝি না।"

বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। তীরবেগে ছুট। লোকে কী মনে করবে ! আমিও দৌড় লাগালুম পিছু-পিছু। ছুটছি আর বলছি, "বাবা, তুমি ছুটো না। বাবা, তুমি ছুটো না। তুমি পড়ে যাবে।" বলতে না বলতেই বাবা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ঘাস তো নেই। ধুলো আর কাঁকর। হাত-পা ছড়ে একাকার। ওপরের ঠোঁটটা থেঁতলে গেল।

“চলো, আবার ডাক্তারবাবুর কাছে চলো। টেট-ভ্যাক নিতে হবে।”

“আমি কিচ্ছু নেব না। আজ বাদে কাল চোখের সামনে একজন মারা যাবে, সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয়জন, আর আমরা জীবন জীবন করব। আমি চাই, আমার ধনুষ্টঙ্কার হোক।”

হঠাৎ মনে হল, আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। আমার বাবার চেয়ে বড়। ধুলো-জড়ানো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, “বাবা, অমন করতে নেই। তোমার এই চেহারা দেখলে মা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। মাকে জানতে দিলে চলবে না। ইস, তোমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। কেন তুমি এমন করলে? তোমার রুমালটা দাও, জলে ভিজিয়ে আনি।”

“ছেড়ে দে। বাড়ি চল। যেতে তো হবেই। আজ হোক, কাল হোক, যেতে তো হবেই।”

বাবার পায়েও খুব চোট লেগেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

“একটা রিকশা করব?”

“না না, রিকশা কিসের। আর কি সেদিন আছে? আর সেদিন নেই। চাঁদের আলোয় ছাদে মাদুর পেতে গল্প। ঘাটশিলায় বেড়াতে যাওয়া। বাগানে চাদরের তাঁবু ফেলে বনভোজন। দিন চলে গেছে, বুড়ো।” গলা ধরে এল।

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে গেল। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যেত, যদি সিধুজেঠু আর সন্ন্যাসীকাকু হাল না ধরতেন। সিধুজেঠু বাড়ির একটা দিক একেবারে হাসপাতালের মতো করে ফেলেছেন। আর সন্ন্যাসীকাকু আর-একটা দিককে করে ফেলেছেন মন্দির। উপনিষদ পাঠ করছেন। নাম সঙ্কীর্তন। বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেছে। সন্ন্যাসীকাকু জোর কায়দা করেছেন। বাবাকে এক মিনিট একা থাকতে দিচ্ছেন না। খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে শেষ করে দিচ্ছেন। ফুল দিয়ে রোজ বাড়ি সাজানো হচ্ছে। ঘরে-ঘরে ধূপ জ্বলছে। বাড়িটা যেন আশ্রম হয়ে গেছে।

দুপুরে মায়ের ঘর তখন খালি। মেঝেতে পিংকা আর পুশ জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। পুশটা এর মধ্যে বেশ একটু বড় হয়েছে। আমি মায়ের মাথার কাছে বসে আছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আমার সুন্দর মা, সন্ধেবেলা হরিদ্বারের গঙ্গায় একে-একে প্রদীপ ভাসাচ্ছে। একপাশে দাদি।

একপাশে বাবা। আমি তখন ছোট। কিন্তু আমার সব মনে আছে। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মনসাপাহাড়ের সবচেয়ে কঠিন জায়গাটায় মা উঠতে পারছে না। দাদি ওপরের একটা পাথরে দাঁড়িয়ে মায়ের হাত ধরে সাবধানে টেনে তুলছেন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, মা দাদির কাছে বসে দুপুরবেলা একের-পর-এক অঙ্ক কষছে। আর মায়ের বুদ্ধি দেখে দাদির মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝেই বলছেন, "বাঃ মা, বাঃ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তুমি আমার খনা।"

মায়ের দিকে তাকালুম। কখন চোখ খুলে গেছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে, পিংকা আর পুশের দিকে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। চোখ দুটো নরম রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিলুম।

মা ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ রে, ও দুটো খেয়েছে ?"

"হ্যাঁ মা।"

"তোরা খেয়েছিস ?"

"হ্যাঁ মা।"

"কে রাঁধলে ?"

"আজ সন্ন্যাসীকাকু রাঁধলেন।"

"কী রান্না হল ?"

মাকে বললুম। মা তখন বালিশের তলা থেকে একটা চাবির গোছা বের করে আমার হাতে দিলে।

"শোন বুড়ো। এই হল আমার সংসার। তোর হাতে দিয়ে গেলুম। আর দিয়ে গেলুম তোর বাবাকে। মানুষটা শিশুর চেয়ে শিশু। তুই একটু দেখিস বুড়ো, তা না হলে ও চলে যাবে। দাদি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোর হাতে দিয়ে গেলুম।"

মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছিল। ধীরে-ধীরে চোখ বুজে এল। বুকচাপা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হাতে-ধরা চাবির গোছাটার দিকে তাকালুম। হঠাৎ চোখ থেকে চার-পাঁচ ফোঁটা জল পড়ে গেল। দাদি আমাকে বলেছিলেন, 'দুঃখকে চাপতে শিখবে। সেইটাই মানুষের লক্ষণ। বীরের লক্ষণ। কখনও ভেঙে পড়বে না।' বলার পরই গান ধরেছিলেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু।' আমি অনেক চেষ্টা করলুম, পারলুম না। মা নেই আমি

ভাবতে পারছি না। এই তো আমার মা, এখনও আছে। মাকে আমি ধরে রাখতে পারব না! মা চলে যাবে!

মা আবার ধীরে চোখ খুলল। সারা ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজের মুঠোয় আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে বললে, "হ্যাঁ রে, তোকে কি ওরা জেলে দেবে?"

"না মা, জেলে দেওয়া কি অতই সোজা। দেশে আইন নেই? একটু ভোগাবে।"

"আবার কবে দিন পড়ল?"

"দশ তারিখে দিন পড়েছে।"

"কী হবে বুড়ো?"

"কিছু ভেবো না মা, মিথ্যে মামলা থেকে আমি ঠিকই বেরিয়ে আসব।"

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ডান দিকে, বাগানের দিকের জানলায় বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওই দ্যাখো মা, বাবা।"

মা ফিসফিস করে বললে, "কোথায়?"

"ওই তো বাগানের জানলায়।"

মা কোনও রকমে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, "ওখানে কী করছ? ভেতরে এসো না।"

"তোমার অপরাজিতা গাছে ফুল এসেছে।"

মা মৃদু হাসল। হাত নেড়ে বাবাকে আসতে বলল। এই ক'দিনে বাবার চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেছে। চুলে চিরুনি নেই। একমুখ দাড়ি। বাবা নীল একটা অপরাজিতা হাতে নিয়ে ঘরে এসে মায়ের বিছানার একপাশে বসল। মা বললে, "চুল আঁচড়াওনি, দাড়ি কামাওনি কেন? মন খারাপ করছ কেন? আবার দেখা হবে। আবার, আবার, অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। এবার আর তোমার সঙ্গে নৈনিতাল যাওয়া হল না। পরের বার যাব। আমি যখন থাকব না, তখন নিজের দিকে একটু তাকিও। সময়ে খাওয়া-দাওয়া কোরো। তুমি ওরকম করলে, বুড়োটা যে ভেসে যাবে!"

বাবার হাত থেকে অপরাজিতাটা খসে মায়ের বুকের ওপর পড়ল। বাবার চোখে জল এসে গেছে। আমিও আর বসে থাকতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। একটু আগে মা যেসব কাজ করে যেতে পারল না, সেই সব কাজের কথা বলছিল। আমার অনেক জামার বোতাম ভেঙে গেছে। পিংকা আর পুশ খেলতে খেলতে নতুন চাদরটা ফালা করেছে। ঘরের পেতলের জিনিসপত্র সব ম্যাড়ম্যাড় করছে। তেঁতুল আনিয়ে রেখেছে। মাজার সময় আর পাওয়া গেল না। এমনই সব নানা কাজের কথা।

রাতে আমরা উকিল যোগেনবাবুর কাছে গেলুম। যোগেনবাবু বললেন, "তপনটাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় একবার দাঁড় করানো যেত। কোনও রকমে যদি দুটো-একটা কথা বলানো যেত। তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে কেস খারিজ।"

বাবা বললে, "তপনের বাবাকে একবার বলে দেখব। যদি কোনও রকমে রাজি করানো যায়। আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। একদিকে এই সাঙ্ঘাতিক অসুখ, আর-একদিকে এই কেস।"

"মাঝে-মাঝে ভগবান মানুষকে এরকম পরীক্ষায় ফেলেন। ভেঙে পড়বেন না।"

তপনের বাবা কোনও মতেই রাজি হলেন না। "না মশাই, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। ওসব কোর্ট-কাছারি, আইন-আদালতের মধ্যে যেতে চাই না। তা ছাড়া জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। শ্যামলের বাবা অতি প্রতাপশালী ব্যক্তি।"

বাবা বললে, "ও, তাই না কি?"

আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম। আশ্চর্য মানুষ!

তপনের বাবা বললেন, "আপনার ছেলে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। শ্যামল কী আর এমন করত। তপনের সঙ্গে সকলেই তো মজা করে।"

রাগে, দুঃখে, অপমানে আমরা আবার যোগেনবাবুর কাছে ফিরে এলুম।

যোগেনবাবু বললেন, "এ-সব কেসে সাক্ষী একটা বড় ব্যাপার।

সাক্ষীরাই প্রমাণ করবে কে অপরাধী, কে নিরপরাধী। দেখা যাক কোন রাস্তা দিয়ে কেসটাকে বের করে আনা যায়। আমি আর-একটু স্টাডি করি। একটা ফাঁক-ফোকর বেরোবেই।"

আমরা ফিরে এলুম। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি আজ রুগীর ঘরে মৃত্যুর গন্ধ পেলুম। এখন যে-কোনও মুহূর্তে যা কিছু ঘটতে পারে। মনে-মনে প্রস্তুত থাকুন।" বাবা গেটের কাছে বসে পড়ল। ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে গেল। আমি বললুম, "বাবা ওঠো। চলো, ভেতরে চলো। যা হবার তা হবেই।"

বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কত বড়, কত শক্ত হয়ে গেছিস বুড়ো!"

পথের দিকে তাকিয়ে দেখি, কে একজন আসছেন এই দিকে। একজন মহিলা। কাছাকাছি আসতে চিনে ফেললুম। তপনের মা। গেট খুলে ভেতরে এলেন। দেখেই আমার রাগ হচ্ছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ভদ্রমহিলা বাবাকে বললেন, "আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম। আমার স্বামী, তপনের বাবা, বড় ভীতু। সারা জীবন ভয়ে-ভয়েই কেঁচো হয়ে রইল। আমার ছেলে সাক্ষী দেবে। বুড়ো আমার ছেলের মতো। যা করেছে, আমার ছেলের জন্যেই করেছে। সে সাক্ষী দেবে। আমিও সাক্ষী দেব। কবে যেতে হবে বলুন?"

"মনে হয় দশ তারিখে।"

"দিদি কেমন আছেন?"

"দিদি?" বাবার কথা আটকে গেল।

"আমি একবার দেখে যাব?"

বাবা অতি কষ্টে বলল, "কোনও লাভ নেই।"

তপনের মা একটু ইতস্তত করে চলে গেলেন। বাবা বললে, "অল্প একটু আশার আলো দেখা গেল বুড়ো। এই ঘোর সঙ্কটে দাদিকে স্মরণ কর।"

মা এখন প্রায় অচৈতন্য। সিধুজেঠু সর্বক্ষণ বসে আছেন ঘরে। সন্ন্যাসীকাকু অনবরত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। আর না হয় সামগান।

যোগেনবাবু অদ্ভুত একটা কথা বললেন, "মৃত্যুটা দশ তারিখের আগে হলে আদালতে দরখাস্ত করে দিন নেওয়া যেত।"

আমি অবাক ! এ আবার কী কথা ! আমার সুবিধে হবে বলে মায়ের মৃত্যু এগিয়ে আনার চিন্তা। ছিছি। আমার না হয় সাজাই হোক। আমি জেলে যেতে প্রস্তুত।

দশ তারিখ আজ। দাদিকে প্রণাম করলুম। মাকে প্রণাম করলুম। মা আমার দিকে চোখ মেলে তাকাতেই পারল না। মাথার কাছে গিয়ে 'মা, মা' বলে তিন-চারবার ডাকার পর একবার চোখ মেলেই আবার চোখ বুজে ফেলল। ঠিক দশটার সময় আমরা আদালতে পৌঁছে গেলুম। আমাদের দু'জন মাত্র সাক্ষী। তপন আর তার মা। যোগেনবাবু আগেই তপনকে সব বুঝিয়েছেন, কী বলতে হবে। "তুমি কোনওরকমে বোলো। যা হয়েছে তোমার তো মনে আছে।" তপন বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়েছে।

এগারোটায় আদালত বসল। আসামীর কাঠগড়ায় বসে আছি। ওদের উকিলকে দেখে ভয় করছে। সরকারপক্ষের উকিল যেমন হয়। পুলিশ প্রথমে প্রায় আধঘণ্টা ধরে কেসটা জজসাহেবকে বোঝাল। যা খুশি, তা-ই বলে গেল আমার নামে। আমার মতো খারাপ ছেলে হয় না। আমি সমাজবিরোধী। বিশুদা আরও বেশি সমাজবিরোধী। বিশুদার আখড়ায় গুণ্ডা তৈরি হচ্ছে।

প্রথমেই যোগেনবাবু উঠলেন একে-একে সব অভিযোগের কাটান দিতে। বললেন, "আমার মক্কেলের মতো ভাল ছেলে হয় না।" তিনি আমার স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের দেওয়া ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পড়ে শোনালেন। বললেন, "আমার মক্কেল লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল। প্রতিটি পরীক্ষায় হয় প্রথম, না-হয় দ্বিতীয় হয়। পাড়ার গৌরব। সমাজের গৌরব।"

সঙ্গে-সঙ্গে সরকারপক্ষের উকিল ব্যঙ্গ করে বললেন, "তার প্রমাণ ওই যে ! আক্রান্ত বসে আছে। তার মুখটা দেখুন। কীভাবে ক্ষুর মেরে ফালা করা হয়েছে।"

তাকিয়ে দেখলুম, শ্যামল বসে আছে সামনের আসনে গম্ভীর মুখে।

ডান গালে লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন।

দুই উকিলে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। যোগেনবাবু বললেন, "নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ আজকের কথা নয়, প্রাচীন প্রবাদ। আসামীপক্ষের সাক্ষীরাই বলবেন শ্যামল কীভাবে নিজেই নিজের ওপর ক্ষুর চালিয়েছিল।"

"শ্যামলকে কি আপনার পাগল মনে হয়, না জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ এক যুবক, যে আত্মঘাতী হবে?"

"মারতে এসে মার খেয়েছে।"

"আমাদের সাতজন সাক্ষী একে-একে প্রমাণ করবে আসামী কীভাবে শান্ত, নিরীহ ছেলেকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমাদের এক নম্বর সাক্ষী সেই সময় সাইকেলে চেপে ওই রাস্তায় যাচ্ছিলেন। তিনি বাধা না দিলে শ্যামল এই আদালতে আজ আর হয়তো উপস্থিত থাকতে পারত না।"

আমি অবাক হয়ে দেখলুম, সেই সাইকেল-আরোহী বসে আছেন। যাঁর সাইকেলের চাকায় সরোজের আঙুল ঢুকে গিয়েছিল। শ্যামলের বাবা টাকাপয়সা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বলার অনেক লোক জড়ো করেছেন। এত জন তো সেদিন ঘটনাস্থলে ছিল না। অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম, কীভাবে আমার চরিত্র অন্যের হাতে ভাঙছে আর গড়ছে।

তপনের মা সাক্ষ্য দিতে উঠে সরকারি উকিলের জেরায় তিন মিনিটেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলেন। তিনি ঘটনা ঘটার সময়টা ঠিকমতো বলতে পারলেন না। একবার বলেন চারটে, একবার বলেন ছ'টা। সরোজকেও চিনতে পারলেন না। শ্যামল সেদিন কী পরে ছিল তাও দ্যাখেননি। অপমানিত হয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন।

ভরসা এখন তপন। যাকে নিয়ে ঘটনা। কাঠগড়ায় উঠে শপথ নিতে গিয়েই সে খারিজ হয়ে গেল। অন্য সময় যদিও বা 'ত, ত' করে কিছু বলত, আজ আর মুখ দিয়ে এক ধরনের শব্দ ছাড়া কিছুই বেরোল না। কাঠগড়ায় একটা বোকা জন্তুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুখে বোকার হাসি। এদিক-ওদিক তাকায় আর হাসে। শেষে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল। তার মানে আইনের খেলায় আমি হারছি।

হঠাৎ শ্যামল কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। সবাই অবাক। আমিও অবাক।

শ্যামলকে তো জজসাহেব ডাকেননি। শ্যামল বললে, "আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন।"

জজসাহেব বললেন, "বলো।"

শ্যামলকে শপথবাক্য পাঠ করানো হল। শ্যামল বলতে লাগল, "আমি এক বড় লোকের বাঁদর-ছেলে। আদরে বাঁদর হয়, আমি তাই।"

শ্যামলের বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "এ কী, এ কী ? পাগল হয়ে গেছে ? যেতেই পারে। মাথায় চোট লেগেছিল তো !"

জজসাহেব হাতুড়ি ঠুকে বললেন, "অর্ডার, অর্ডার।"

শ্যামল আবার শুরু করল, "চোট মাথায় নয়। চোট লেগেছে আমার মনে। আমি অনুতপ্ত। আজ বুড়োর মা মৃত্যুশয্যায়, আর মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমরা বুড়োকে টেনে এনেছি আদালতে। এ-সবই আমার বাবার ষড়যন্ত্র। সবার আগে আমার বাবাকে জেলে দেওয়া উচিত। জাল ওষুধ তৈরির অপরাধে। আমার বাবা খুনী। ওই বুড়ো আমার বন্ধু ছিল। বুড়োর দাদি আমাকে পড়াতেন। বুড়ো ভাল ছেলে, ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয় বলে আমার হিংসে ছিল, রাগ ছিল। আমিও ভাল হতে চেয়েছিলুম। হতে পারিনি। কারণ কেউ আমাকে ভাল হতে বলেনি। অঢেল টাকা আমার সর্বনাশ করেছে। বদ বন্ধু দিয়েছে। বদ নেশা দিয়েছে। বদ খেয়াল দিয়েছে। বুড়ো আমাদের স্কুলের ফার্স্টবয়। বুড়ো আমাদের পাড়ার গর্ব। তপন আমাদের পাড়ার দুঃখ। অমন একটা সুন্দর ছেলে ভালভাবে কথা বলতে পারে না। আর আমরা কয়েকজন এমন শয়তান, তাকে দেখলেই নানাভাবে অত্যাচার করি। জামাপ্যান্ট খুলে নিই। ছেলেটার অসহায় অবস্থা আমাদের আনন্দ দেয়। সে যখন কাঁদে, আমরা তখন সবাই মিলে হো-হো করে হাসি। আজ আমার সেই ব্যাঙের গল্পটা মনে পড়ছে। ছেলেরা ডোবার-ব্যাঙকে বড়-বড় পাথর ছুঁড়ে মারছে। ব্যাঙ বলছে, তোমাদের আনন্দ আমাদের মৃত্যু। সেদিন আমরা তপনের ওপর আমাদের পুরনো খেলা খেলতে গিয়েছিলুম। বুড়ো বাধা দিতে এলে, বুড়োকেও আমরা চেপে ধরেছিলুম। বুড়ো অপমান বাঁচাবার জন্যে লাথি ছুঁড়ছিল, তখন আমি ক্ষুর মারতে গিয়ে ওর লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ি। পড়ার সময় আমার ক্ষুরে আমি আহত হই। এই ক্ষুর-চালাচালি আমাকে

কারা শিখিয়েছে ? আমারই পাড়ার দাদারা। শিখিয়েছে হিন্দি সিনেমা। আমাকে কেউ ভাল হতে শেখায়নি। বলেছে মস্তান হও। মস্তান হলে তুমি নেতা হবে। নেতা হলে তোমার অনেক টাকা হবে। বলেছে, চোর হও, সাধুদের দিন শেষ। জজসাহেব, আপনি বুড়োকে ছেড়ে দিন। আমাকে ধরুন। আমার বাবাও বাবা, আবার বুড়োর বাবাও বাবা। বুড়োকে আপনি ছেড়ে দিন। বুড়ো অনেক বড় হবে। বুড়ো বৈজ্ঞানিক হবে।"

শ্যামলের বাবা আবার চিৎকার করে উঠলেন, "ও মিথ্যে কথা বলছে। পাগল হয়ে গেছে।"

জজসাহেব হাতুড়ি ঠুকলেন, "অর্ডার, অর্ডার।"

সারা কোর্টঘর নিস্তব্ধ। কাঠগড়ায় শ্যামলকে যেন অনেক বড় মনে হচ্ছে। কপালে চুল ঝুলে পড়েছে। বড়-বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। জজসাহেব কেস ডিসমিস করে দিলেন। আমরা আদালতের বাইরে এসে গাছতলায় দাঁড়ালুম।

শ্যামলের বাবা শ্যামলকে ফেলে রেখে তাঁর ঝকঝকে গাড়ি চেপে হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় শ্যামলকে বলে গেলেন, "তোমাকে আমি দেখে নেব।"

শ্যামল চিৎকার করে বললে, "থ্যাঙ্ক ইউ গডফাদার।"

বাবা এগিয়ে গিয়ে শ্যামলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। "তুমি গ্রেট। তোমার কোনও তুলনা নেই। হাত মেলাও।"

শ্যামল বললে, "আমি আপনাদের বাড়িতে একবার যেতে পারি ?"

"কেন পারবে না !"

"যে মাসিমা আমাকে এত ভালবাসতেন, তাঁকে একবার প্রণাম করব।"

"এরপর তুমি কোথায় থাকবে ? বাড়িতে ?"

"বাড়িতে আমার জায়গা হবে না। আমি হারিয়ে যাব। রোজ কত ছেলেই তো হারিয়ে যায় ! বাবাই হয়তো খুন করিয়ে দেবে !"

"বলো কী ?"

"ভদ্রলোককে তো আপনি ভালই চেনেন।"

শ্যামল আমার হাত দুটো ধরে বললে, "বুড়ো, আমাকে ক্ষমা কর।"

আমার তখন ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভাবছি, কত তাড়াতাড়ি মাকে

গিয়ে আমার ছাড়া পাবার খবরটা দিতে পারব। ভাগ্য ভাল, একটা গাড়ি পাওয়া গেল। যোগেনবাবু বললেন, "আজকের হিরো হল এই ছেলেটি, শ্যামল। আদালতের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। তবে তুমি ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছ। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় এখন তাই দ্যাখো।"

শ্যামল বললে, "যা করেছি, জেনেশুনেই করেছি। যা করব এরপর, তাও আমার ঠিক করা আছে।"

যোগেনবাবু বললেন, "তা হলে আপনারা এবার বাড়ি যান। আর দেরি করবেন না।"

গাড়ি যখন বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসেছে, তখন আমার বুকটা হঠাৎ কেমন যেন খালি হয়ে গেল। মনে হল, একটা আকাশ যেন ঢুকে পড়েছে। ছেঁড়া ত্রিপলের মধ্যে দিয়ে যেমন ফালা-ফালা নীল আকাশ দেখা যায়, অনেকটা সেইরকম। কী হল ? কেন এমন হল ?

গাড়ি গেটের সামনে ঢুকতেই দৌড়ে বাড়ির ভেতর গেলুম। সন্ন্যাসীকাকু নাম করছেন। আমি 'মা মা' বলে ঘরে ঢুকতেই সিধুজেঠু আমাকে কাছে টেনে নিলেন। কানের কাছে মুখ এনে আস্তে-আস্তে বললেন, "বাইরে নয়, এবার ভেতরে ডাকো।"

"কেন সিধুজেঠু ?"

"একবার তাকিয়ে দ্যাখো, মায়ের কেমন রূপ খুলেছে। দেবী !"

খাটের ওপর শুধু ফুল। অজস্র ফুল। বড়-বড় পদ্ম, সাদা গোলাপ। মা আমার ঘুমিয়ে পড়েছেন। যে-ঘুম আর ভাঙবে না।

অনেক অনেক দিন হয়ে গেল। বহু দিন। সব ফাঁকা। মায়ের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামল সেই রাতে শপথ করেছিল, বুকের চিতায় যে আগুন আছে, সেই আগুন একবার যখন জ্বলে উঠেছে, আর সে আগুন নিভতে দেবে না। সাতটা দিন সে আমাদের বাড়িতে ছিল। এর মাঝে একদিন তাকে কে বা কারা গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। দশ দিনের দিন সি· বি· আই-এর লোক এসে শ্যামলদের বিশাল বাড়ি তল্লাশি করে শ্যামলের বাবাকে জেলে ভরে

দিয়েছে। তার আগেই সন্ন্যাসীকাকু শ্যামলকে ওঙ্কারেশ্বরের আশ্রমে রেখে এসেছেন। শ্যামল আর সে শ্যামল নেই।

বাবা এককথায় চাকরি ছেড়ে দিল। সত্যি-সত্যিই, কাঠ আর কয়লার একটা ডিপো করেছে। দেখতে হয়েছে একেবারে ঋষির মতো। খাটো একটা ধুতি আর গেঞ্জি পরে যখন কাঠ কি কয়লা ওজন করে, তখন মনে হয় একজন শ্রমিক। নানা জনে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। শোনেনি কারও কথা। বলেছিল, স্বাধীন হব। ঘাম ঝরিয়ে জীবিকা অর্জন করব। পরিশ্রম না করলে সৎ হওয়া যায় না। সিধুজেঠু সেই থেকে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেছেন। সাতটার সময় রোজ মায়ের ঘরে দু'জনে নাম সঙ্কীর্তন করেন। বাবার হাতে মন্দিরা। জ্যাঠার কোলে খোল। সন্ন্যাসীকাকু সব শিখিয়ে দিয়ে বিলেত চলে গেছেন বক্তৃতা করতে।

আর আমার সম্বল মায়ের একটা চিঠি। অসুস্থ শরীরে আমাকে একটা চিঠি লিখে বালিশের তলায় রেখেছিল। সেই চিঠিই আমার পথ। সেই চিঠিই আমার গুরু।

*স্নেহের বুড়ো,*

*আর কয়েকদিন পরেই আমি চলে যাব। দূরে, বহু দূরে। আমার অনেক সাধ ছিল, কত কী করার ছিল। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে গেল। জীবনে একবারই দেখা হয়। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি বড় হও। যত পারো, বেড়ে ওঠো। আমি নেই বলে তোমার বড় হওয়া যেন আটকায় না। আমার জন্যে মন খারাপ কোরো না। আমি নেই বলে আরও বেশি করে থাকব। তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি তোমাকে দেখব। তোমার বাবা যেনএইরকম শিশুই থাকেন। বোলো তাঁকে। যেখানে আমি যাচ্ছি, সেখানে তোমরা থাকবে না, এইটাই আমার দুঃখ। যাওয়াটা এইরকম আগে পরেই হয়ে যায়। যে খেলার যা নিয়ম!*

*সব সময় সোজা পথে চলবে। সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধি দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। রোজ আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। নিজের মুখ দেখবে স্থির নজরে। যখনই দেখবে চোখের উজ্জ্বলতা কমছে, তখনই চিন্তার দিকে নজর দেবে। চিন্তাই মানুষ। একা থাকবে না। কাজকে সঙ্গী করবে। বাবার মতো গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপক্ষীকেই বন্ধু করবে।*

সবুজের ঘরে থাকলে মানুষ চির-সবুজ থাকে। দিতে শিখবে, নিতে নয়। 'আমি আমি' করবে না। 'আমি' বলে কিছু নেই। সবই 'তুমি'। ভেতরটাকে বড় করলে বাইরেটা বড় হয়। নকল থেকে আসল বেছে নিতে শেখো। তোমার দাদির বাড়িকে অপবিত্র কোরো না। প্রতিষ্ঠা মানে সত্যের প্রতিষ্ঠা। ঐশ্বর্য হল চরিত্র। যুদ্ধ হল নিজের সঙ্গে। জয় হল নিজেকে জয়।

সব সময় মনে রাখবে তুমি কোন্ পরিবারের ছেলে। পিতা, মাতা, পিতামহকে ভুলো না।

বিদায়। অনেক অনেক ভালবাসা। জল নয়, আগুন।—ইতি তোমার মা।